সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

এপ্রিল-মে, ২০১৯ ■ ৪৮তম বর্ষ ■ প্রথম সংখ্যা ■ মূল্য দু'টাকা

যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিপালিত মে দিবস

অসিত ভট্টাচার্য

বিজয় শংকর সিংহ

প্রতি বছরের মতই এই বছরেও, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় দপ্তর কর্মচারী ভবনে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে প্রতিপালিত হল আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস, ঐতিহাসিক মে দিবসের কর্মসূচী। এবারের মে দিবস যখন প্রতিপালিত হয়, তখন সারা দেশের সাথে আমাদের রাজ্যেও লোকসভা নির্বাচনের প্রক্রিয়া চালু ছিল। স্বভাবতই একাংশের কর্মী সদস্যরা নির্বাচনী দায়িত্ব প্রতিপালনের কাজে যুক্ত ছিলেন। এতদ্সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য জমায়েত হয়েছিল এই কর্মসূচীতে।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই রক্তপতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি অসিত কুমার ভট্টাচার্য। অসিত ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে মূল সভার কাজ শুরু হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ এবং কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব প্রবীর

প্রবীর মুখার্জি

মুখার্জি। সাধারণ সম্পাদক তাঁর বক্তব্যে ১৩৩ বছর আগে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটের শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছিল সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, পরবর্তী পর্বে মে দিবসের তাৎপর্য শুধুমাত্র ৮ ঘণ্টা কাজের দাবির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ধীরে ধীরে তা পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে, শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলার সংগ্রামে পর্যবসিত হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন দেশে যখন মে দিবস প্রতিপালিত হয়, সমকালিন পরিস্থিতিও মে দিবসের সংগ্রামী এজেন্ডায় অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন বর্তমান বছরে যখন মে দিবস প্রতিপালিত হচ্ছে, তখন আমাদের দেশে লোকসভা নির্বাচন প্রক্রিয়া চলছে। ফলে শ্রমজীবীদের জীবন জীবিকার স্বার্থে এই নির্বাচনে চরম দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পরাস্ত করে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করার বিষয়টি মে দিবসের লড়াই-এর সাথে যুক্ত হয়ে গেছে। এছাড়াও রাজ্যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের প্রসঙ্গটিও এবারের মে দিবসের অন্যতম এজেন্ডা।

কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব প্রবীর মুখার্জী তাঁর বক্তব্যে শ্রমিক শ্রেণী তথা শ্রমজীবী মানুষের শোষণ মুক্তির দিশারী কার্ল মার্কস ও ফ্রেডেরিক এঙ্গেলসের শোষণমুক্তির তত্ত্বের সংক্ষিপ্তসার উল্লেখ করেন।

সভা শেষে উপস্থিত কর্মী সদস্যদের বর্ণাঢ্য মিছিল শহীদ মিনার ময়দানের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সমাবেশের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। □

শহীদ মিনারের পথে

শহীদ মিনার ময়দানে মে দিবসের কেন্দ্রীয় সমাবেশ

শহীদ মিনার ময়দানের কেন্দ্রীয় সমাবেশে অংশগ্রহণকারী কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নসমূহ ও ১২ই জুলাই কমিটির প্রতিনিধিদের নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়। সমাবেশে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন সিআইটিইউ-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক অনাদি সাহু। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সিআইটিইউ-র সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তপন সেন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ১২ই জুলাই কমিটির পক্ষে বক্তব্য রাখেন অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক তপন দাশগুপ্ত। □

মুখ্যমন্ত্রী সমীপে সংগঠনের পত্র

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ তারিখ ঃ ১০.০৬.২০১৯
নবান্ন, হাওড়া
মাননীয়া,

আপনি ইতিপূর্বে গত ৩ ডিসেম্বর, ১৮ তারিখে আমাদের প্রেরিত পত্রের (পত্র নং কো-অর্ডি-৯৫/১৮ তারিখ ৩/১২/১৮) মাধ্যমে অবহিত আছেন যে, বিগত ২৯ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে কর্মচারী সমাজের বকেয়া মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান, ষষ্ঠ বেতন কমিশন দ্রুত চালু সহ কিছু জরুরী বিষয়ে নবান্নে টিফিনের সময় অর্থাৎ ব্যক্তিগত সময়ে শান্তিপূর্ণভাবে শুধুমাত্র দাবি উত্থাপন করার পরিপ্রেক্ষিতে আপনার পুলিশ আমাদের সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সহ ১৮ জন নেতৃত্বকে হিংস্র আচরণ করে গ্রেপ্তার করে। পরবর্তীতে সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক সহ ১৫ জন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের অনৈতিকভাবে দার্জিলিং, কালিম্পং ও মুর্শিদাবাদ জেলায় বদলী করা হয়।

আমরা মনে করি এই আদেশনামা আপনার দেওয়া প্রতিশ্রুতির পরিপন্থী। এমতাবস্থায়, প্রশাসনের অভ্যন্তরে আমাদের বৃহত্তর সংগঠনের কাজ সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার জন্য বদলী হওয়া নেতৃত্বকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনার দাবি জানাচ্ছি।

পাশাপাশি, কর্মচারী সমাজের অসহনীয় সমস্যা বকেয়া মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান, ষষ্ঠ বেতন কমিশন অবিলম্বে চালু করা সহ উক্ত দাবিসমূহ দ্রুত ও সুষ্ঠু সমাধানের লক্ষ্যে আপনার বহুমুখীন ব্যস্ততার মধ্যেও দ্রুত আলোচনার জন্য দিন ও সময় ধার্য করার অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদান্তে,

ভবদীয়
(বিজয় শংকর সিংহ)
সাধারণ সম্পাদক

বেতন কমিশনের চেয়ারম্যানকে পত্র

মাননীয় চেয়ারম্যান তারিখ ঃ ০২.০৫.২০১৯
রাজ্য ষষ্ঠ বেতন কমিশন
বিকাশ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা-৯১
মহাশয়,

আপনার স্মরণে আছে যে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য গঠিত সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে এবং রাজ্যের কোষাগার থেকে বেতন প্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠনের দাবিতে সংগঠিত ধর্মঘটের পটভূমিতে রাজ্য সরকার গত ২৭ নভেম্বর, ২০১৫ ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন করেন। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য গঠিত এই বেতন কমিশনের নির্ধারিত বিচার্য বিষয়ের প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার তার নির্দেশিকায় ৬ মাসের মধ্যে চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট করেন এবং প্রয়োজনে কমিশনকে অন্তর্বর্তী রিপোর্ট দেওয়ার কথা জানান।

আপনি এও জানেন যে সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য কার্যকরী হয়েছে এবং সংশোধিত বেতন কাঠামোর উপর বিভিন্ন সময়ে মহার্ঘভাতা ঘোষিত হওয়ায় রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ন্যূনতম বকেয়া মহার্ঘভাতার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪১ শতাংশ।

আমরা অত্যন্ত আশ্চর্যের সঙ্গে দেখলাম যে ছ'মাসের মূল মেয়াদ উত্তীর্ণ হওযার পর বিভিন্ন পর্যায়ে আরও তিন বছর মেয়াদ বৃদ্ধি করার পরেও ষষ্ঠ বেতন কমিশনের কোন অন্তর্বর্তী রিপোর্ট রাজ্য সরকারের কাছে জমা পড়েনি এবং বকেয়া মহার্ঘভাতা নিষ্পত্তির বিষয়ে কমিশন কোন সুপারিশ প্রেরণ করেনি। বরং এই বেতন কমিশনের মেয়াদ আরও ছ'মাসের জন্য বৃদ্ধি করা হলো, যার সময়সীমা আগামী ২৬ মে, ২০১৯ সমাপ্ত হচ্ছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে ৫ বার সময়সীমা বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে মোট সাড়ে তিন বছর সময়ের মধ্যে আশাকরি আপনারা আপনাদের কাজ সমাপ্ত করে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দিতে পারবেন।

ইতিপূর্বে রাজ্যের মাননীয় অর্থমন্ত্রী সর্বশেষ বাজেট সংক্রান্ত সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন যে, ষষ্ঠ বেতন কমিশনের অন্তর্বর্তী রিপোর্ট রাজ্য সরকারের কাছে জমা পড়েছে। যদিও রাজ্য বাজেটে এর কোন প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়নি।

এই ঘটনায় পশ্চিমবাংলার রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে বিপুল অসন্তোষ ও তীব্র ক্ষোভ তৈরী হয়েছে। বেতন কমিশন ও মহার্ঘভাতা বকেয়া থাকায় রাজ্যের কর্মচারী সমাজ কার্যত অর্ধেক বেতন নিয়েই বর্দ্ধিত প্রশাসনিক দায়িত্ব এমনকি নির্বাচনী দায়িত্ব প্রতিপালন করে প্রশাসনকে সচল রাখতে সহায়তা করে চলেছে।

তাই, আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে জানাতে চাই যে, অতি দ্রুত বেতন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করে এবং কর্মচারী স্বার্থে সেই সুপারিশ যাতে দ্রুত কার্যকরী হয় সে ব্যাপারে আপনাকে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করার অনুরোধ করছি।

আশাকরি, এ ব্যাপারে আপনি অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ধন্যবাদান্তে,

ভবদীয়
(বিজয় শংকর সিংহ)
সাধারণ সম্পাদক

সারা ভারত কর্মচারী ফেডারেশনের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা

গত ১-২ জুন ২০১৯ দু'দিন ধরে সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটির সভা এক অত্যন্ত জটিল ও কঠিন পরিস্থিতির গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে চণ্ডীগড়ে ইলেকট্রনিক এবং টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনীয়ার্স দপ্তরের হলে, পাঞ্জাব সাব-অর্ডিনেট সার্ভিসেস ফেডারেশনের উদ্যোগে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

সুতপা হাজরা

সভার শুরুর প্রাক্কালে চণ্ডীগড়ের ভাকনা ভবনে প্রকাশ্য জমায়েতের কর্মসূচী হয়। উক্ত কর্মসূচীতে বিশাল কর্মচারী জমায়েতে স্থানীয় বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব সহ সাধারণ সম্পাদক এ শ্রীকুমার বক্তব্য রাখেন।

সভার প্রথমে পাঞ্জাব রাজের সংগঠন পি এস এস এফ-এর

▶▶ ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে

সম্পাদকীয়

ভোট শেষ, নতুন যুদ্ধ শুরু

মাত্র কিছুদিন আগেই শেষ হলো লোকসভা নির্বাচন। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার, সর্ববৃহৎ নির্বাচন। এবারের নির্বাচনটি ছিল স্বাধীন ভারতে ১৭তম লোকসভা নির্বাচন। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের ব্যবস্থাপনায় মাসাধিককাল সময় ধরে মোট সাত দফায় দেশজুড়ে ৫৪৩টি আসনের জন্য নির্বাচন হয়। ভোট দিতে পারতেন, অর্থাৎ ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করেছিলেন, এমন নাগরিকের সংখ্যা ছিল প্রায় ৯৩ কোটি। এখন পর্যন্ত যা জানা গেছে, তা হলো প্রায় ৬৫ শতাংশ ভোটার তাঁদের সংবিধান স্বীকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন। অর্থাৎ ভোট দিয়েছেন এমন মানুষের সংখ্যা প্রায় ৬০ কোটি। যা সমগ্র ইওরোপীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মোট জনসংখ্যার থেকেও বেশি। এই সুবিশাল কর্মযজ্ঞ শেষে ফল প্রকাশিত হয়েছে ২৩ মে। জনগণের রায়ের অভিমুখ খুব স্পষ্ট। কারা সরকার গঠন করতে পারবেন, তা নিয়ে কোনো ধোঁয়াশা না থাকায়, নতুন সরকার গঠন, নতুন মন্ত্রিসভার শপথ ইত্যাদি কাজও দ্রুত সম্পন্ন হয়েছে। এ পর্যন্ত বলা সব কথাগুলিই পাঠক বন্ধুদের জানা। তবু মূল বিষয়ে প্রবেশের আগে গৌরচন্দ্রিকা হিসেবে উল্লেখ করতেই হলো। গৌরচন্দ্রিকার 'পুনশ্চ' হিসেবে আরো দু-একটি কথা বলে মূল বিষয়ে প্রবেশ করব। প্রথমত, ভোটদানে মানুষের প্রবল উৎসাহ (যা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক দিক) থাকলেও, সর্বত্র বিনা বাধায় উৎসবের মেজাজে তাঁরা তা দিতে পেরেছেন, তা কিন্তু নয়। বিশেষত, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে সাধারণ মানুষকে আক্রান্ত ও রক্তাক্ত হতে হয়েছে। দ্বিতীয় যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য তা হলো, নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়াকে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছে, তা কিন্তু নয়। কেন্দ্রীয় শাসকদলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় শাসকদলের সর্বভারতীয় সভাপতির বক্তব্য বহু ক্ষেত্রেই আদর্শ নির্বাচন বিধির সীমারেখা লঙ্ঘন করলেও, তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করতে নির্বাচন কমিশন অনেকাংশেই ব্যর্থ হয়েছে। স্বতঃপ্রণোদিত হয়েতো দূরের কথা, এমনকি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এ ব্যাপারে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও, কমিশন নড়েচড়ে বসেনি। মূলত, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের এই এক-দেশদর্শী ভূমিকার জন্যই কমিশনের অপর এক সদস্যের সাথে তাঁর মত বিরোধও প্রকাশ্যে চলে এসেছে। এহেন পক্ষপাতমূলক ভূমিকা ভবিষ্যতে সংশোধিত না হলে, সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিটাই যে দুর্বল হবে, তা বলাই বাহুল্য।

তবে এখনকার মতো এই আলোচনাটাকে এখানেই মুলতুবি রেখে এবং ভবিষ্যতে এই বিষয় নিয়ে আরো অনেক বেশি চর্চা ও আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে, একথা মাথায় রেখেই, আসুন আমরা প্রসঙ্গান্তরে যাই। এবারের নির্বাচনী ফলাফলের মূল অঙ্কটি, ষোড়শ নির্বাচনের কার্যত প্রতিবিম্ব। ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের মতোই এবারের নির্বাচনেও শ্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এনডিএ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করেছে। এমনকি এনডিএ'র মোট প্রাপ্ত আসন গতবারের থেকেও বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ নামক উগ্র হিন্দুত্ববাদী তথাকথিত সাংস্কৃতিক সংগঠনটির রাজনৈতিক শাখা সংগঠন ভারতীয় জনতা পার্টিও (বিজেপি) এককভাবে পুনরায় সংসদে গরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। এমনকি জোটের মতোই এককভাবেও গত নির্বাচনের থেকে তারা আসন সংখ্যা বাড়িয়ে নিতে পেরেছে। ষোড়শ নির্বাচনে বিজেপি তিনশো ছুঁতে পারেনি, কাছাকাছি গিয়ে থেমে গিয়েছিল। এবার কিন্তু তারা তিনশোর গণ্ডীও পেরিয়ে গেছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর পর শ্রী নরেন্দ্র মোদীই হলেন তৃতীয় রাজনৈতিক নেতা, যাঁর নেতৃত্বে কোনো একটি রাজনৈতিক দল পরপর দু'বার এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলো।

শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দলে, তাঁর পূর্বসুরী শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী পরপর তিনবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন। প্রথমবার মাত্র ১৩ দিনের জন্য, তারপরে ১৩ মাস ও সবশেষে পূর্ণ সময়ের জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু কোনোবারেই তাঁর দলের একক গরিষ্ঠতা ছিল না। জোট সঙ্গীদের নিয়ে চলতে হয়েছিল। একই কথা প্রযোজ্য ডঃ মনমোহন সিং সম্পর্কেও। তিনিও টানা দশ বছর (২০০৪-২০১৪) প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাঁরও দ্বিতীয় দফার প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রথমবারের তুলনায় সংসদে তাদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিল প্রায় ৬০টি। কিন্তু কোনোবারেই তাদের একক গরিষ্ঠতা ছিল না। জোট সঙ্গীদের নিয়ে গড়ে ওঠা ইউপিএ-১ এবং ইউপিএ-২'র নেতা হিসেবে মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন।

স্বভাবতই এ কথা অনস্বীকার্য যে নরেন্দ্র মোদী তাঁর দুই পূর্বসুরীর সাফল্যকে ছাপিয়ে গেলেন। এমনকি গত শতাব্দীর নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে যে জোট রাজনীতি সর্বভারতীয় স্তরে একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্টে পরিণত হচ্ছিল, তাকেও বহিরঙ্গের দিক থেকে না হলেও, অন্তর্বস্তুর দিক থেকেও অনেকটাই ধাক্কা দিতে পারলেন। কারণ নামে এনডিএ সরকার হলেও বিজেপি ব্যতীত অন্য দলগুলির গত পাঁচ বছরে সরকার পরিচালনায় কোনো ভূমিকাই ছিল না। এবারেও ঐ দলগুলি থেকে যাঁরা মন্ত্রী হয়েছেন, তাঁদের ভূমিকা হবে জাঁকজমকপূর্ণ 'সাক্ষী গোপাল'। বিহারের নীতীশ কুমারের দল ব্যাপারটা আঁচ করেই সম্ভবত মন্ত্রিত্বের প্রলোভন আপাতত ত্যাগ করেছে।

কিন্তু যে বিষয়টি বিশেষ চিন্তার উদ্রেক করে তা হলো—নরেন্দ্র মোদীর এই বিপুল সাফল্য, তা কি সত্যিই গত কয়েক বছরের ভারতীয় রাজনীতির গতি প্রকৃতির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ? ১৯৭১ সালে দ্বিতীয়বারের জন্য যখন ইন্দিরা গান্ধীর দল একক গরিষ্ঠতা পায় (তিন শতাধিক আসন), সেই সাফল্যের রসায়ন হিসেবে কাজ করেছিল, নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বের কয়েকটি বিষয়। যেমন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার জাতীয়করণ এবং রাজন্যভাতা বিলোপ প্রভৃতি। এবং ইন্দিরা গান্ধী স্লোগান তুলেছিলেন 'গরিবী হটাও'। কতটা আন্তরিক ছিলেন, তা দেশের মানুষ পরবর্তী পর্বে উপলব্ধি করেছেন। সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিন্তু তাঁর কয়েকটি ইতিবাচক পদক্ষেপ (তৎকালীন বৃহৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থেই গৃহীত, কিন্তু জনস্বার্থ বিরোধীও নয়। ওয়েলফেয়ার রাষ্ট্রের যে দ্বৈত চরিত্র) এবং বাংলাদেশ যুদ্ধের সাফল্যকে ভিত্তি করে, একটি জনমোহিনী স্লোগানের সাহায্যে তিনি নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়েছিলেন।

অথচ এবারের নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর বিপুল সাফল্যের অনুঘটক হিসেবে, তেমন কোন ইতিবাচক পদক্ষেপের কথা কি আমরা স্মরণ করতে পারি? বরং বিপরীতটাই কি সত্যি নয়? এটা ঠিকই যে প্রথমবার ক্ষমতায় বসার আগে শ্রী নরেন্দ্র মোদী শ্রীমতি গান্ধীর মতই বেশ কয়েকটি জনমোহিনী স্লোগান হাজির করেছিলেন। যেমন, 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' ইত্যাদি। কিন্তু তাতো ছিল, ইউ পি এ - ২ সরকারের 'অ্যান্টি ইনকামবেন্সী' ফ্যাক্টরকে ব্যবহার করার কৌশল। পাঁচ বছর নির্ঝঞ্ঝাটে সরকার চালানোর সুযোগ পেয়েও, এমন কোন পদক্ষেপ কি তিনি গ্রহণ করেছিলেন, যাকে এক বাক্যে ইতিবাচক বলা যেতে পারে? বরং বিপরীতটাই কি সত্যি নয়? 'নোটবন্দী' বা অপরিকল্পিতভাবে জি এস টি চালু করার সিদ্ধান্ত কি, মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জি ডি পি) সিংহভাগই আসে যে অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকে তার মেরুদণ্ডটাকেই ভেঙ্গে দেয়নি? এমনকি তিনি যে 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' স্লোগান দিয়েছিলেন, তারই বা পরিণতি কি হয়েছে? জনসংখ্যার প্রায় ষাট ভাগ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে কৃষিক্ষেত্রের ওপর নির্ভরশীল, সে ক্ষেত্রের সংকট বেড়েছে, আরও বেশী অভাব ও দুর্দশায় জড়িয়ে পড়েছেন আমাদের অন্নদাতা কৃষক সমাজ। আমাদের দেশের জনসংখ্যার প্রায় ষাট ভাগ নবীন প্রজন্ম (বয়স ১৫-৪০ বছর)। এদের একটা বড় অংশই নরেন্দ্র মোদীর প্রথম দফার শুরু থেকেই কর্মহীন ছিলেন। 'সবকা বিকাশের স্লোগান তাঁদের হাতে কাজ আর পেটে ভাত দিতে পারেনি। বরং যাঁরা কোনমতে গ্রাসাচ্ছাদন করতেন, নোটবন্দী আর জিএসটি-র ধাক্কায় তাঁদেরও অনেকেই নতুন করে কর্মহীন হয়েছেন। এই দুইয়ের যোগফলে নরেন্দ্র মোদী জমানার অন্তিম লগ্নে বেকারির হার গত ৪৫ বছরে সর্বোচ্চ জায়গায় পৌঁছেছিল। মোদী সরকার বহু চেষ্টা করেছিল এই সমস্ত তথ্য নির্বাচনের আগে ধামাচাপা দিতে কিন্তু পারেনি। এমনকি একে কেন্দ্র করে, কেন্দ্রীয় সরকারেরই বিভিন্ন বিভাগের অভ্যন্তরে চাপান-উতোরের সংবাদও প্রকাশ্যে চলে এসেছিল। এর সাথে পেট্রো পণ্য সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের, বিশেষত খাদ্যশস্যের নিয়মিত ব্যবধানে মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গটিতো ছিলই। কৃষিক্ষেত্রের সংকট, বেকারী ও মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে এমন কতগুলি সংকট যা খালি চোখে দৈনন্দিন জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করা যায় এবং যা জনমানসে সরকার বিরোধী ক্ষোভ তৈরী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে সাধারণভাবে বিবেচিত হয়।

এর বাইরেও দেশীয় অর্থনীতির স্বাস্থ্য পরিমাপের কয়েকটি মাপকাঠি, যা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় তেমন স্পষ্টত ধরা পড়ে না, কিন্তু অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা যেগুলির ভিত্তিতে অর্থনীতির হালহকিকৎ বোঝার চেষ্টা করেন, সেগুলিও এই সময়কালে দুর্বল হয়েছে বলে বিভিন্ন সংবাদ এখনতো প্রকাশিত হচ্ছেই, এমনকি নির্বাচনের আগেও হয়েছে। যেমন মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার, শিল্পোৎপাদনের সূচক, ভোগ্যপণ্যের চাহিদার সূচক, আমদানি-রপ্তানির ফারাক ও তজ্জনিত মূলধনী খাতে ঘাটতি বৃদ্ধি প্রভৃতি। এককথায় অর্থনীতির সাধারণ ছবি বা স্ক্যানারের তলায় রাখা ছবি, কোনটিই মোদী সরকারের প্রতি জনগণের পুনরায় আস্থা জ্ঞাপনের ইঙ্গিত বহন করেনি।

শুধু যে পাঁচ বছর ধরে জনগণের দুর্দশা বেড়েছে, আর জনগণ সেই দুর্দশাজনিত ক্ষোভকে পাঁচ বছর ধরেই মনের মধ্যে পুষে রেখেছিলেন, একেবারে বৈদ্যুতিন ভোট যন্ত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার প্রতিফলন ঘটাবেন বলে, তা কিন্তু নয়। কারণ উক্ত পাঁচ বছরের বিভিন্ন সময়ে, বিশেষত ২০১৬ সালের পর, একের পর এক মেহনতী মানুষের আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়েছে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। এর মধ্যে কয়েকটি আন্দোলন এমন বিশাল আকার ধারণ করেছিল, যে কর্পোরেট পুঁজি পরিচালিত মিডিয়াও সেই সংবাদ পরিবেশন না করে পারেনি। যেমন নাসিক-মুম্বই পঞ্চাশ হাজার কৃষকের লং-মার্চ, দিল্লীর বুকে মজদুর-কিষাণ সংঘর্ষ র‍্যালি এবং এ বছরের গোড়ায় (৮-৯ জানুয়ারি) প্রায় ২০ কোটি শ্রমজীবী মানুষের সর্বভারতীয় ধর্মঘট ও সাথে কৃষক সংগঠনগুলির ডাকে গ্রাম-ভারত বন্ধ। এই ধারাবাহিক আন্দোলন সংগ্রামগুলি জনসমাজের গড় রাজনৈতিক চেতনারও যে গুণগত পরিবর্তন ঘটাচ্ছিল, তার প্রমাণ বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত কয়েকটি উপনির্বাচন ও বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল। ঐ নির্বাচনগুলিতে শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দলকে পরাজিত হতে হয়েছে। এরই অনুসারীতো হওয়ার কথা এবারের লোকসভা নির্বাচনের ফল। বিভিন্ন সময়ে শ্রমজীবী মানুষের খণ্ড খণ্ড জয় বা অগ্রগতি, লোকসভা নির্বাচনের মঞ্চে সামগ্রিক চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল না কেন?

এর কারণ এখনই এককথায় বলা সম্ভব নয়। অনেক আলোচনা বিশ্লেষণ জরুরী। কিন্তু আমরা আপাতত একটি সম্ভাব্য কারণের দিকে দৃষ্টি ফেলতে পারি। দেশীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রটিকে দেশীয় কর্পোরেট পুঁজি ও আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজির মৃগয়া ক্ষেত্রে পরিণত করার জন্য, মোদী সরকারের নির্লজ্জ চাটুকরিতা ছিল দিনের আলোর মতন স্পষ্ট। স্বভাবতই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সর্বভারতীয় ঐক্যবদ্ধ মঞ্চকে ব্যবহার করাটা সহজতর হয়েছে। এমনকি এই লড়াইটা অনেকাংশেই পুরোনোও। কর্পোরেট ও লগ্নী পুঁজির চাটুরিকতা যে মোদী সরকারই প্রথম শুরু করল, তা কিন্তু নয়। মাত্রাগত তারতম্য কিছুটা হয়ত ছিল, কিন্তু চাটুরিকতা শুরু হয়েছিল সেই নব্বই-এর দশক থেকেই। এর বিরুদ্ধে লড়াই-এর ঐক্যবদ্ধ মঞ্চের নির্মাণটাও হয়েছিল সেই সময় থেকেই। সময়ের সাথে সাথে তা পোক্ত হয়েছে, বর্ধিত শক্তিকে একত্রিত করে (রাজ্যভিত্তিক এবং সর্বভারতীয় স্তরে কৃষকের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন)।

এই লড়াইয়ের শরিক যে সমস্ত সংগঠন, তাদের অনুগামী অংশ খুব স্বাভাবিকভাবেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া উদারবাদী কক্ষপথ অনুসরণকারী নীতিসমূহ ও শ্রমজীবীদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের যে দ্বন্দ্ব, তার দিকেই। এই দ্বন্দ্বে শ্রমজীবী মানুষের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মূল শাখা সংগঠনগুলির অন্যতম বিজেপি (সঙ্ঘের রাজনৈতিক শাখা। বিজেপি কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজনৈতিক দল নয়)। তাহলে, অন্যান্য প্রধান প্রধান শাখা সংগঠন এবং অসংখ্য অপ্রধান শাখা সংগঠন (সংখ্যা কত জানা নেই) এই সময়কালে কি চুপ করে বসেছিল? শুধু নাগপুর থেকে বিজেপি-কে কিছু নির্দেশ দিয়েই দায় সেরেছে? না, আর এস এস নিজে এবং তার প্রতিটি শাখা সংগঠন বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন সাজে জনসমাজের বিভিন্ন অংশকে টার্গেট করে তাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে। লক্ষ্য ছিল একটাই ধর্মীয় মেরুকরণ, সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে (বিশেষত মুসলমান) বিদ্বেষ ছড়ানো এবং এর অনুষঙ্গ হিসেবে বর্ণ কাঠামোটাকে আরও মজবুত করা। প্রচারের ঢাক-ঢোল না পিটিয়ে এই কাজটা তারা করেছে নীরবে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা সম্ভবত একেই 'সোশ্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং' বলছেন। গো-রক্ষক বাহিনী, লাভ জিহাদ, অ্যান্টি রোমিও স্কোয়াড, মহম্মদ আখলাখ, জুনেইদ খান, উন্নাও, কাটুয়ার ঘটনা—এসবই হল ধর্মীয় মেরুকরণের সুপরিকল্পিত ধারাবাহিক প্রক্রিয়া জন সমাজ কতটা আত্তীকরণ করতে পারল তা মেপে দেখার সুচিন্তিত পদক্ষেপ। বিজেপি-র বিভিন্ন স্তরের নেতরা মাঝে মাঝে যে মন্তব্য করেন, তারও উদ্দেশ্য কিন্তু একই। এমনকি গান্ধীজী ভারতীয় জাতির পিতা নন, পাকিস্তানের পিতা বা গান্ধীহত্যাকারী নাথুরাম গড়সে দেশপ্রেমিক ছিলেন—এই ধরনের জঘন্য মন্তব্য তারা তখনই করেছে, যখন বুঝেছে ধর্মীয় মেরুকরণের লক্ষ্যে তারা অনেকটাই সফল।

আচ্ছা, এই ভয়ংকর ধর্মীয় মেরুকরণ ভিত্তিক সোশ্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং, এর বিরুদ্ধে সত্যিই কোন ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা গেছে? বামপন্থীরা সর্বশক্তি নিয়ে চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাদের শক্তি দেশের বিস্তীর্ণ অংশে নিতান্তই দুর্বল, আবার যেখানে তাদের শক্তি কেন্দ্রীভূত, সেখানেও প্রতিবাদটা হয়েছে অনেকটাই ওপরে ওপরে। ধর্মীয় মেরুকরণের বিপদ, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধ্বংসাত্মক চেহারা সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে সভা, সমাবেশ, মিছিল, সেমিনার হয়েছে যথেষ্টই। কিন্তু আর এসএস-সহ সঙ্ঘ পরিবারের প্রচারের যে বিপুল নেটওয়ার্ক, তার সমান্তরালে কাউন্টার প্রচারের নেটওয়ার্কটা যেভাবে গড়ে তোলা যায়নি। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক্ষেত্রে একটা বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে হাজির হয়েছে। তুলনায় প্রচারটা অনেক বেশী ফলপ্রসু হয়েছে কেরালায়। কিন্তু সেখানে কেন্দ্রে ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গঠনের প্রশ্নে মানুষ কংগ্রেসকে সমর্থন করেছে। যে সমস্ত রাজ্যে বামপন্থীদের শক্তি কেন্দ্রীভূত, সে সমস্ত রাজ্যের দীর্ঘ ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহ্যের কারণেই সম্ভবত তাদের মনে আত্মতুষ্টি বাসা বেঁধেছিল। তাঁরা মনে করেছিলেন বামশক্তির শিকড় এত গভীরে যে ধর্মীয় মেরুকরণের ঝাপটায় তা স্থানচ্যুত হবে না। কিন্তু বাস্তব চিত্র কিন্তু তা বলছে না, বরং বামপন্থীদের আত্মসমীক্ষা করা প্রয়োজন বলে দিক নির্দেশ করছে। তবুও একমাত্র বামপন্থীরাই ধারাবাহিক চেষ্টা করছে। এর বাইরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কিছু প্রগতিশীল, বাম মনোভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবী সোচ্চারে প্রতিবাদ করেছেন। তাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন এমনকি হত্যাও করা হয়েছে তাঁদের কয়েকজনকে। কিন্তু বাকিরা কোথায়? এমনকি গান্ধী-নেহেরুর উত্তরাধিকারী আজকের জাতীয় কংগ্রেস? তাদেরই বা ভূমিকা ছিল কতটুকু, একটি সর্বভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষ দল হিসেবে? ফলে অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে, সামাজিক স্তরে তা কার্যত ছিল অনুপস্থিত। তাই আর্থিক সংস্কার প্রক্রিয়া সময়ান্তরে হোঁচট খেয়েছে, ড্যামেজ কন্ট্রোলের জন্য জনধন যোজনা, প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও বা ঘরে ঘরে এলপিজি কানেকশন পৌঁছে দেবার মতন কর্মসূচী নিতে হয়েছে। কিন্তু ধর্মীয় মেরুকরণ কর্মসূচী চোখের আড়ালে রূপায়িত হয়েছে নির্বিঘ্নে বামপন্থী রাজনৈতিক শক্তি ও প্রগতিমনস্ক বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদটুকু ছাড়া। ফলস্বরূপ নির্বাচনের প্রাক্-পর্বে সঙ্ঘ পরিবার বুঝেছে অর্থনীতির ক্ষেত্রে মোদী সরকারের ব্যর্থতাকে আড়াল করে সামনে নিয়ে আসতে হবে এমন কিছু বিষয় যা ধর্মীয় মেরুকরণের সার দেওয়া মানব জমিনে ফুল ফোটাতে পারে। তাইতো দেশপ্রেম, উগ্র জাতীয়তাবাদ, পুলওয়ামা, বালাকোট, পাকিস্তান ইত্যাদি প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে এসেছে মোদী-শাহর প্রচারে। তাঁরা এতটাই আত্মবিশ্বাসী হয়ে প্রচারে নেমেছিলেন, যে অমিত শাহ সংখ্যালঘুদের ছারপোকার মতন পিষে মারার কথা বলেও হাততালি পেয়েছেন। ফল যা হয়েছে, তা আমাদের সামনেই রয়েছে।

একদিকে ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের অপরিসমী ব্যর্থতা ও জনজীবনের সংকট। অপরদিকে সুকৌশল সাম্প্রদায়িক প্রচার ও মানানসই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিকল্পনা। আপাতত, দ্বিতীয়টি প্রথমটিকে কিছুটা দূরে ঠেলে দিতে পারল। কিন্তু কতদিন? হাতে কাজ না থাকা, পেটে ভাত না থাকার যন্ত্রণাকে কি পুলওয়ামা, পাকিস্তান ও উগ্রদেশপ্রেমের দাওয়াই দিয়ে দীর্ঘদিন দমিয়ে রাখা যাবে? মোদীজী যে জার্মান ও ইতালির পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চান, তাঁরা পেরেছিলেন? □

১০ জুন, ২০১৯

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা

ডঃ এম কে পান্ধে

এদেশের শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম শীর্ষ নেতৃত্ব ডঃ এম কে পান্ধের এই লেখাটি সংগঠনের দশম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত সংগ্রামী হাতিয়ারের বিশেষ সংখ্যা (১৯৯২) থেকে নেওয়া হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে লেখাটির প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা করে পুনর্মুদ্রণ করা হল।

সাম্প্রদায়িকতার বিষ সমাজের অগ্রগতি, দেশের ঐক্য এবং অখণ্ডতার পক্ষে একটি ভয়ঙ্কর বিপদ। তাই প্রতিক্রিয়ার শক্তি নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ বজায় রাখার লক্ষ্যে জনগণের আন্দোলন বিপর্যস্ত করার জন্য সর্বদাই এই অস্ত্র ব্যবহার করে থাকে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ জাতীয় আন্দোলন বানচাল করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করার এই হাতিয়ার সবসময় ব্যবহার করতো। ঔপনিবেশিক শাসন বজায় রাখার জন্য বিভেদ সৃষ্টি করে সাম্রাজ্য শাসনই ছিল সাম্রাজ্যবাদী নীতির মূল পন্থা। বিদেশী শাসকেরা পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মীয় মৌলবাদকে মদত দিত এবং সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নবাদী শক্তিকে চাঙ্গা করবার জন্য মাঝে মাঝেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে দিত। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনকে স্বাভাবিকভাবেই ভয়াবহ সাম্প্রদায়িকতাবাদী শক্তিসমূহের মোকাবিলা করতে হয়েছে, জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখার জন্য। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ঐক্য ছাড়া জাতীয় আন্দোলনের অস্তিত্বই বিপন্ন হতো।

ঔপনিবেশিক শাসনকালেই শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। শ্রমিকশ্রেণীর ধর্মঘট, সংগ্রামের সময় তাঁদের ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি প্রায়ই শিল্প-শহরগুলিকে বেছে নিত আক্রমণের লক্ষ্য হিসাবে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে ওঠার প্রথম পর্যায়কালেই বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসের শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখার জন্য বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়েছিল। শ্রমিকশ্রেণীর সকল অংশের মধ্যে ঐক্য স্থাপন ছিল ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীচেতনার উন্মেষ ঘটানোর অন্যতম অপরিহার্য শর্ত।

ধর্মের ভিত্তিতে দেশবিভাগ এবং তারই পরিণতিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আসে। ধর্মীয় ভিত্তিতে বিপুলসংখ্যক মানুষের চলে যাওয়া এবং চলে আসার ফলে উদ্বাস্তু সমস্যার সৃষ্টি হয়। এর ফলে এক সম্প্রদায়ের ধর্মের প্রতি অপর সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় এবং তাদের অনেকে সাম্প্রদায়িক প্রচারের শিকার হয়ে পড়ে। ধর্মীয় সৌহার্দ্য রক্ষার পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য গান্ধীজীকে ধর্মীয় উন্মাদনার শিকার হতে হয় এবং আততায়ীর গুলিতে জীবন দিতে হয়।

ভারত ও পাকিস্তানের পারস্পরিক সম্পর্ক যাতে সর্বদাই চাপের মধ্যে থাকে সাম্রাজ্যবাদীরা তার ব্যবস্থা করেছে এবং দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা জীইয়ে রেখেছে। মার্কিনীদের দ্বারা পাকিস্তানকে পুরোপুরি অস্ত্রসজ্জিত করে তোলা সাম্প্রদায়িক ঘৃণার আগুন জ্বালিয়ে রাখার পরিকল্পিত প্রয়াস মাত্র। ভারতীয় উপ-মহাদেশে সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধির বাঞ্ছিত ফললাভই এর প্রকৃত লক্ষ্য।

হিন্দু মৌলবাদীরা যাতে এই দেশে তাদের প্রভাব দৃঢ় করতে পারে সেজন্য সাম্রাজ্যবাদীরা সর্বদা তাদের উৎসাহ যুগিয়েছে এবং সবরকম নৈতিক ও বৈষয়িক সাহায্য দিয়ে চলেছে। একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলিম মৌলবাদীদেরও মদত দিয়ে চলেছে যাতে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা অব্যাহত থাকে। শিখ মৌলবাদীরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের কাছ থেকে নিয়মিত সাহায্য পাচ্ছে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে মদত দেবার জন্য সুবিধাজনক এলাকা হিসাবে পাকিস্তানকে ব্যবহার করা হচ্ছে। খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী মানুষকে গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য গীর্জাগুলির মাধ্যমে খ্রীষ্টীয় মৌলবাদীরা প্রচুর সাহায্য পেয়ে থাকে। ভারতের জনগণকে বিভক্ত করে রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা সব ধর্মের সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিকে এইভাবে সাহায্য-সহায়তা করে চলেছে। কিন্তু এই বিপজ্জনক খেলার স্বরূপ পুরোপুরি উদ্ঘাটন করা হয়নি এবং সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের স্বার্থ সিদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের ব্যবহার করতে পারছে।

শ্রমিকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার

সমাজের অংশ হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীও এই সাম্প্রদায়িকতার বিষ থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। এটা সত্য যে, মাঝে মাঝে বৃহৎ শিল্পনগরীগুলিতে দাঙ্গায় প্ররোচনা দেবার জন্য বিশেষভাবে অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। সাম্প্রতিককালে ভিওয়ান্দি, মালেগাঁও-এর মতো যন্ত্রচালিত তাঁত-শিল্পের কেন্দ্রগুলিতে এবং জামশেদপুর, রাঁচি, কানপুর, ভাগলপুর, বরোদা, আমেদাবাদ, হায়দ্রাবাদ, মীরাট, বারাণসী ইত্যাদি শিল্প নগরীগুলিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত করা হয়েছে। এ থেকে সমস্যাটির গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

এইসব সাম্প্রদায়িক শক্তি ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের যন্ত্রণাকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে এক সম্প্রদায়কে অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবহার করে। উদ্দেশ্য, দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রমজীবী মানুষ তাদের মূল শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরিবর্তে যেন নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এইসব ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় নিহতদের অধিকাংশই গরীব দিনমজুর বা কর্মচারী।

সচেতন ও শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ঘাঁটিগুলিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শ্রমিকদের রক্ষা করার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ট্রেড ইউনিয়নগুলি নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছে। এইসব আক্রমণের সময় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন হতচকিত হয়ে পড়েছে এবং বিপজ্জনক এই শক্তির মোকাবিলায় কোনরকম প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারেনি। এটাও অস্বীকার করা যায় না যে কিছু ট্রেড ইউনিয়ন সাম্প্রদায়িক প্রচারের শিকার হয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

এটা সর্বজন বিদিত যে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে এবং তাদের কর্মীরা খোলাখুলিভাবে সাম্প্রদায়িক প্রচার চালাচ্ছে। তারা আজকাল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে নেমে পড়েছে এবং দাঙ্গা কবলিত শহরগুলিতে শ্রমিকদের সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডে অংশ নিতে প্ররোচিত করছে। হিন্দু শ্রমিকদের মধ্যে মুসলমানদের সম্পর্কে ঘৃণা সৃষ্টি করতে যে কোন তুচ্ছ ঘটনাকে এরা ব্যবহার করে থাকে। ভারতীয় মজদুর সংঘ যদিও মাঝে-মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে অংশ নেয় কিন্তু এরা উগ্র হিন্দুয়ানীতে প্রভাবিত এবং এদের নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের লোকজনেরা। অখিল ভারতীয় মজদুর সংঘের নেতৃত্ব সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী কথা মুখে বলে থাকে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারাই সাম্প্রদায়িকতার প্রবক্তারূপে সারা দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক অভিযান চালিয়ে থাকে। তাদের নীতিই হ'ল শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য বিঘ্নিত করা এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে ভাগ করে দেওয়া। প্রতিবছর বি এম এস হিন্দু সাম্রাজ্য দিবস পালন করে এবং হিন্দু রাষ্ট্র বা হিন্দু আধিপত্যের ভাবনা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে প্রকাশ্যেই প্রচার করে। মতাদর্শগতভাবে তারা এই দেশের প্রতিক্রিয়াশীল এবং শোষকশ্রেণীগুলির স্বার্থেরই সেবা করে।

মূল শত্রুকে আড়াল করার কৌশল

ভারতের শ্রমিকশ্রেণী যখন সরকারের জাতীয়-স্বার্থ বিরোধী আর্থিক নীতির বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামে অবতীর্ণ তখন নানা ছল-ছুতোয় বি এম এস নেতৃত্ব সেই সংগ্রাম থেকে দূরে সরে থাকছে। শ্রমিকশ্রেণীর চাপে পড়ে তারা যদিও এই আর্থিক নীতির বিরুদ্ধে বলতে বাধ্য হচ্ছে কিন্তু এই নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারা সামিল হচ্ছে না।

রাম জন্মভূমি-বাবরী মসজিদ বিতর্কে উগ্র-হিন্দুত্ববাদীদের অপকৌশলকে বি এম এস সমর্থন করে। হিন্দু মৌলবাদীদের এই আন্দোলন হল শ্রমিকশ্রেণী, তথা ভারতের সাধারণ মানুষের প্রকৃত সমস্যাগুলি থেকে শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে দেবার কৌশল। বি এম এস নিজেকে অরাজনৈতিক সংগঠন বলে ঘোষণা করে বটে কিন্তু প্রতিটি রাজনৈতিক প্রশ্নে তারা বি জে পি-র নীতিকেই সমর্থন করে।

শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এই বিপজ্জনক ঝোঁকগুলির বিরুদ্ধে লড়াই না করে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক নীতির বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রামকে শক্তিশালী করা যাবে না। কেন্দ্রীয় নীতির বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার অপরিহার্য পূর্বশর্ত হ'ল শ্রমিকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ নির্মূল করা।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলি সঠিক নীতি অনুসরণ করার জন্য সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সম্ভব হয়েছে এবং বিগত ১৫ বৎসর এই রাজ্যে কোন দাঙ্গা ঘটতে পারেনি। এমনকি ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের পর শিখ-বিরোধী দাঙ্গার সময়ও শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রমিক ও জনগণ এই রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কাছে নিরাপত্তা পেয়েছিল।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ঐক্য

শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে সাম্প্রদায়িক এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। অন্যান্য পার্থক্য যাই থাকুক না কেন, এই ঐক্য অর্জন করতে না পারলে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সংগ্রাম কখনই আকাঙ্ক্ষিত ফললাভ করতে পারে না।

সকল সম্প্রদায়ের ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলা উচিত। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে আমাদের এই দেশকে দুর্বল করার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিষয়ে শ্রমিকশ্রেণীকে সচেতন করতে তাদের মধ্যে জোরালো প্রচার চালানো বিশেষ প্রয়োজন। এই বিষয়ে ব্যাখ্যামূলক পুস্তিকা প্রকাশ করে শ্রমিকদের মধ্যে তা ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা উচিত। এই প্রচারের দ্বারাই দেশের সাম্প্রদায়িক এবং বিচ্ছিন্নতার শক্তিগুলিকে কোণঠাসা করা সম্ভব হবে এবং সাম্প্রদায়িক শক্তির অনিষ্টকর প্রচার থেকে শ্রমিকশ্রেণীকে রক্ষা করা যাবে।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে এই কাজকে অন্যতম জরুরী কাজ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে কারণ এর গুরুত্ব এখন সর্বাধিক। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবময় ঐতিহ্য এবং আমাদের শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাস, সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিকদের অনুপ্রাণিত করতে আমাদের সহায়ক হবে।

সাম্প্রদায়িকতার সক্রিয় মোকাবিলায় পুঁজিপতি শ্রেণী ব্যর্থ হয়েছে। এরা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে বিভক্ত করার জন্য সামন্ততান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে মিলিতভাবে সাম্প্রদায়িকতার অস্ত্রকে ব্যবহার করেছে। সেজন্য একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই পারে সাম্প্রদায়িক এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে।

ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলন যদি পরিস্থিতির উপযোগী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে এবং সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে পারে তবে তা দেশের ঐক্য রক্ষায় বিপুলভাবে সাহায্য করবে এবং আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণী ও লক্ষ লক্ষ খেটে খাওয়া মানুষের জীবনের মান উন্নত করার লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে। □

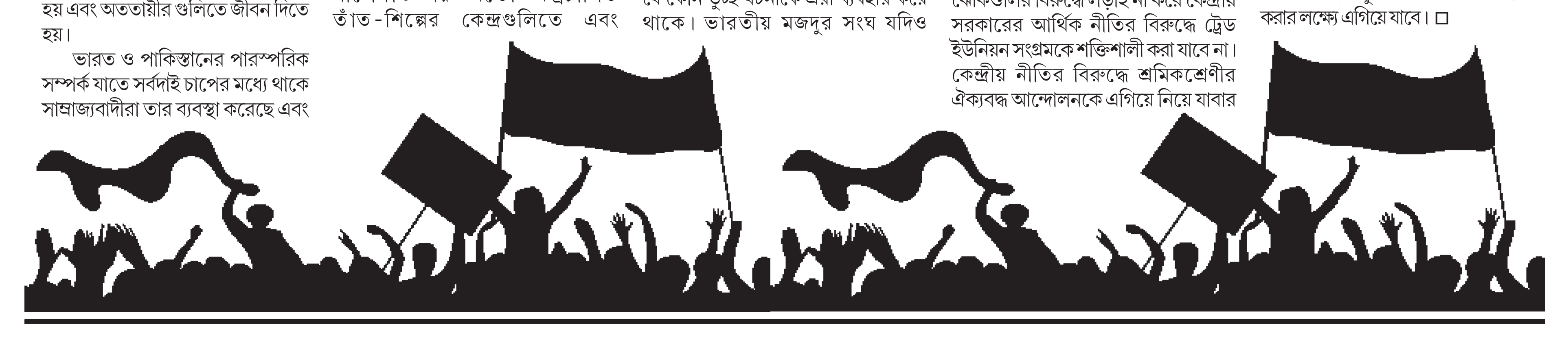

বিশ্বকবির প্রতিবাদী চেতনা ও আমাদের শিক্ষা

সুমিত ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সারা জীবনের যে বিপুল ও অবিস্মরণীয় সৃষ্টি, তার মধ্যে এমন অসংখ্য মণি-মুক্তা ছড়িয়ে রয়েছে, যার প্রত্যেকটি ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা অথবা পাতার পর পাতা রচনার বিষয় বা সাবজেক্ট হতে পারে। আমাদের দেশের তো বটেই, এমনকি ভিনদেশী এমন বহু প্রথিতযশা রবীন্দ্রানুরাগীর কথা আমরা জানি, যাঁরা তাঁদের মেধা-পুঁজির একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় করেছেন, শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথকে জানা, বোঝা ও উপলব্ধি করার জন্য। এবং তারপরেও তাঁদের অতৃপ্তির আক্ষেপ থেকে যায়। আসলে এক বিরল বহুমুখী প্রতিভার কলম থেকে সৃষ্ট যে জ্ঞান-সমুদ্র তার গভীরতম প্রান্ত বিন্দু পর্যন্ত পৌঁছনো বিপুল প্রতিভাবান জ্ঞান-পিপাসু ডুবুরির পক্ষেও হয়তো বা অসাধ্য কাজ।

আমরা রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ নই। নই কোন পন্ডিতপ্রবর সাহিত্য সমালোচকও। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আমাদের একান্ত আপনজন, আমাদের হৃদয়ের আবেগ। রবীন্দ্রনাথ কেন্দ্রিক আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে এবং ঘটেও দুভাবে—(১) ১২ মাসে তেরো পার্বণের অন্যতম পার্বণ হিসেবে প্রতি বছর ২৫ বৈশাখে ঘটা করে রবি ঠাকুরের ছবিতে মালা দিয়ে দু কলি রবীন্দ্রসঙ্গীত, দু-চার লাইন রবীন্দ্র কবিতা পাঠ করা। রবি-পূজাকে আরও একটু জাঁক-জমকপূর্ণ করার জন্য সকালে প্রভাত ফেরী আর সন্ধ্যায় তাঁর 'প্রেম' অথবা 'প্রকৃতি' পর্যায়ের সঙ্গীত ও কবিতা নিয়ে গুরু গম্ভীর সেমিনার এবং সর্বশেষে পেন্নাম ঠুকে সমস্বরে বলা 'আসছে বছর আবার হবে।' এক কথায় একজন রক্ত-মাংসের মানুষকে জোর করে তেত্রিশ কোটি কল্পলোকের দেবতার গোত্রভুক্ত করে, তাঁকে পুজো-অর্চনার ব্যবস্থা সম্পন্ন করে ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন। হয়ত বা তাঁর পদবি ঠাকুর হবার ফলে তাঁকে দেবত্বে উন্নীত করার কাজটা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে। এখন তো আবার ভক্তি প্রদর্শনের হিড়িক আমাদের রাজ্যে বেড়েছে। রাস্তায় রাস্তায় ট্রাফিক সিগন্যালে দিবারাত্র বাজছে রবীন্দ্র সঙ্গীত। গাড়ী-ঘোড়ার কর্কশ হর্নের শব্দ। হকারদের নিজস্ব পণ্য ফেরি করার জন্য পরিত্রাহি চিৎকার আর তারই ফাঁকে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে জর্জ বিশ্বাসের কণ্ঠে— এই করেছ ভাল নিঠুর হে! সত্যিই আক্ষরিক অর্থে আমরা এখন রবীন্দ্রনাথকে ছাড়া এক পাও এগোতে পারছি না। রবীন্দ্র ভাবাবেগ এই গতিতে এগোতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত বা ২৫ বৈশাখ 'থিম পুজো' চালু হয়ে যেতে পারে। পাড়ায় পাড়ায় মন্ডপে রবীন্দ্রনাথকে একদিক রেখে ২৭ বৈশাখ রেড রোডে হবে কার্নিভাল শো। গত কয়েক বছরে এরাজ্যে রাস্তায় রাস্তায় ব্যানার-ফ্লেক্স-হোর্ডিং-এ যেভাবে রবীন্দ্রনাথের ছবির সাথে পাল্লা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি ব্যবহার করা হচ্ছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে উপরোক্ত আশঙ্কা অমূলক নাও হতে পারে।

(২) আরও যেভাবে আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে এবং ঘটেও, যদিও কিছুটা দুর্বলভাবে তা হল রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন ও সৃষ্টি থেকে শিক্ষা ও প্রেরণা গ্রহণ করে জীবনের চলার পথে তাকে ব্যবহার করা। এক কথায় রবীন্দ্র-শিক্ষাকে জীবনে পাথেয় করা। আমরা খুব সুস্পষ্ট ভাবেই দ্বিতীয় দলে। রবীন্দ্রনাথের ওপর দেবত্ব আরোপ করে নয়, একজন মানবতাবাদী কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিক হিসেবে তাঁর যে বিপুল সৃষ্টি সম্ভার তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তাকে পুঁজি করেই আমরা পথ চলতে চাই।

দুই

এই নিবন্ধে আমরা দেখার চেষ্টা করব, বোঝার চেষ্টা করব প্রতিবাদী রবীন্দ্রনাথকে। যিনি তাঁর কৈশোরকাল থেকেই সমস্ত রকম অন্যায়-অবিচার, শোষণ-বঞ্চণা, অপশাসন-কুশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। যেমন বাল্যকালে চৈত্রমেলায় তিনি যে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন, তা ছিল— "ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা/যে গায় গাক আমরা গাব না/আমরা ধরিব আরেক তান..."

আমাদের দেশে শুধু না, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে যখনই কোন অন্যায় মাথা তুলেছে এবং তার খবর পৌঁছে গেছে কবির কাছে, তৎক্ষণাৎ তাঁর লেখনী গর্জে উঠেছে সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে। এমন অসংখ্য উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে কবির সমগ্র জীবনে। কিন্তু নিবন্ধকারের সীমিত ক্ষমতায় সীমিত পরিসরে আলোচনাকে সূত্রায়িত করার জন্য শুধু বেছে নেব কয়েকটি উদাহরণ সেখানে রবীন্দ্রনাথ ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এবং শ্রমজীবী মানুষের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে কেনই বা এই দুটি বিষয়কে শুধুমাত্র বেছে নেওয়া হল। বেছে নেবার কারণটি খুবই সরল। এই মুহূর্তে যে দুটি বিপদ আমাদের দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সামনে অস্তিত্বের সঙ্কট সৃষ্টি করছে, সে দুটি হল— (ক) পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের তীব্র শোষণ প্রতিদিনই বিপুল সংখ্যক মানুষ দারিদ্র্যের অতলে তলিয়ে যাচ্ছেন এবং (খ) উগ্র মৌলবাদী শক্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আসীন হবার ফলে, সাম্প্রদায়িকতার বিপদ দেশের ঐক্য ও সংহতিকে বিপদাপন্ন করে তুলেছে। কিন্তু দুঃখের হলেও সত্যি এই দুই বিপদের যুগপৎ আক্রমণকে রোখার জন্য সারা দেশজুড়ে যে ধরনের জোরালো প্রতিবাদ ধ্বনিত হওয়ার কথা, তা হচ্ছে না। এমনকি যাঁরা নিজেদের বুদ্ধিজীবীগোত্র ভুক্ত বলে দাবি করেন, তাঁদেরও এক উল্লেখযোগ্য অংশ 'ওপিনিয়ন মেকার'-এর ইতিহাস নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন। এঁদের অনেকেই কথায় কথায় রবি ঠাকুর আওড়ালেও, রবীন্দ্রনাথের সেই আহ্বান 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া/ বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া'—এতে সাড়া দিতে তাঁরা নারাজ। সরকারী পারিতোষিক কেন্দ্রিক আত্মশ্লাঘার ঘেরাটোপে থাকতেই তাঁরা স্বচ্ছন্দবোধ করছেন। কিন্তু ইতিহাস বলে তাঁদের এই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ গোবরের ঘুঁটেতে পরিণত হওয়া ও আগুনে নিক্ষেপিত হওয়ার প্রাক্ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রাপ্ত স্বাচ্ছন্দ্যের মতই স্বল্পস্থায়ী। আর যাঁরা সাহসভরে শুরু থেকেই প্রতিবাদ করছেন, তাঁরা সংখ্যাগত দিক থেকে এই মুহূর্তে কিছুটা দুর্বল হলেও, তাঁদের জোরালো কণ্ঠস্বর ও আত্মত্যাগী ভূমিকার (নরেন্দ্র দাভোলকর, কালবুর্গী, গোবিন্দ পানসারে, গৌরী লঙ্কেশ) ঢেউ আপাত নিশ্চল জনসমাজে খুব ধীরে হলেও হিল্লোল তুলেছে। অপেক্ষা শুধু প্রতিবাদের ঝড় ওঠার যা জনসমাজের অভ্যন্তরে ধীরে প্রবাহিত হিল্লোলকে বিশালাকৃতি ঢেউয়ে পরিণত করতে পারে। সম্প্রতি লোকসভা নির্বাচনের ফল দেখে একে সুদূর পরাহত মনে হলেও, ইতিহাসের শিক্ষা হল এই সাময়িক পিছু হটা চূড়ান্ত নয়। প্রকৃতির কোন এক স্থানে সৃষ্ট হওয়া বায়ুশূন্যতাকে পূরণ করার জন্য চারপাশ থেকে ছুটে আসা বাতাসই ঝড় সৃষ্টি করে। সমাজ বিজ্ঞানে সংগঠিত উদ্যোগই হল সেই ছুটে আসা বাতাস যা প্রতিক্রিয়াহীন শূন্যতাকে ভরাট করে ঝড় সৃষ্টি করতে পারে। আর সংগঠিত উদ্যোগকে মানসিক বল দিতে পারেন আমাদের রবীন্দ্রনাথই। আসুন চাতকের তৃষ্ণা নিয়ে যাই রবীন্দ্রনাথ নামক ঝর্নার কাছে।

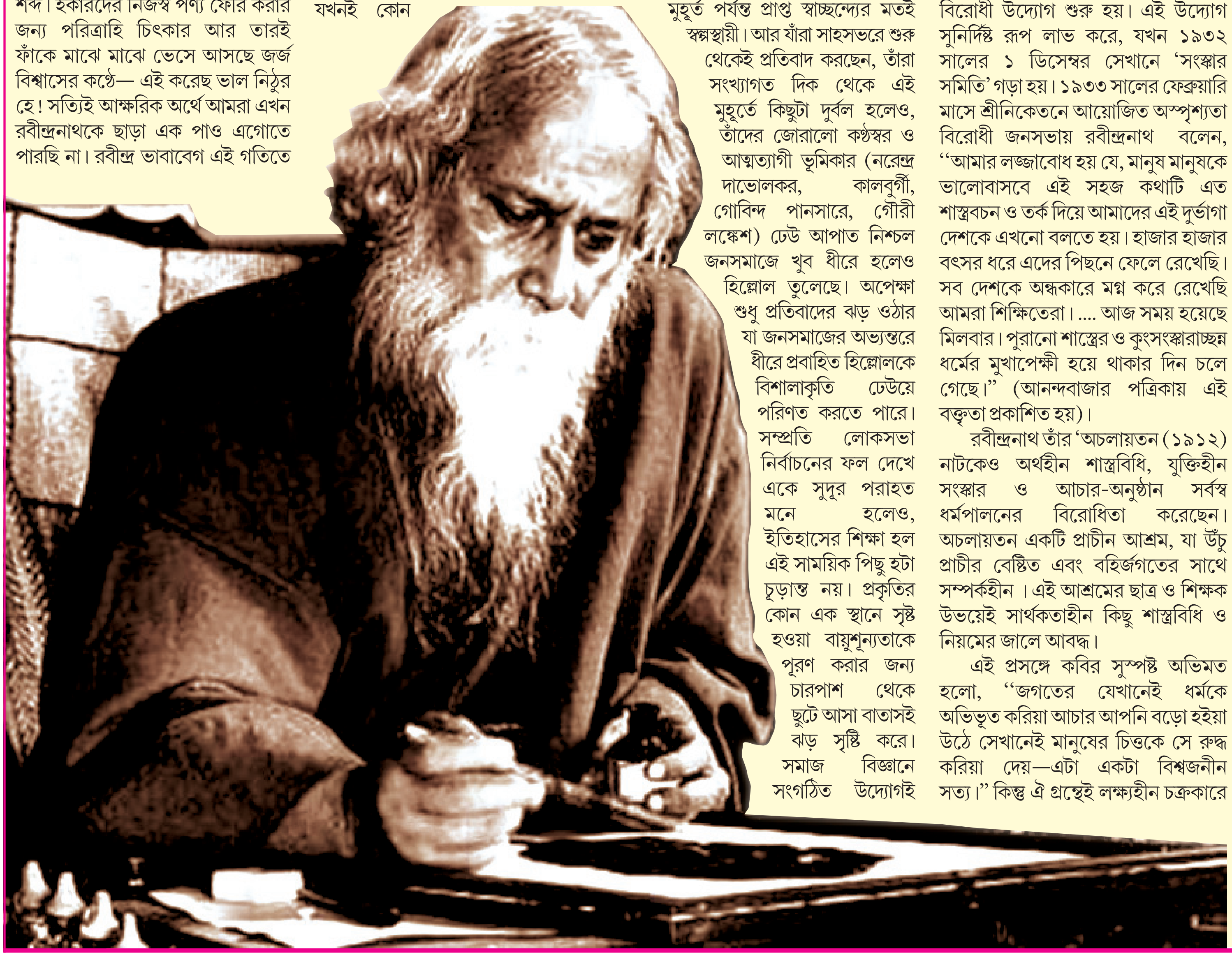

তৃতীয়

রবীন্দ্রনাথ প্রথাগত অর্থে বস্তুবাদী ছিলেন না। তাঁর সমগ্র জীবন ও কর্মে উপনিষদের প্রভাব ছিল অটুট। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তাঁর ঈশ্বর স্বর্গলোকবাসী দশহাত বা তিনচক্ষু বিশিষ্ট দেবতা নন। তাঁর কথায়— "আমার ভগবান মানুষের যা শ্রেষ্ঠ তাই নিয়ে। তিনি মানুষের স্বর্গেই বাস করেন।" তিনি আরও বলেছেন—"হেথায় দাঁড়ায়ে দু-বাহু বাড়ায়ে নমি নর-দেবতারে।" প্রথাগত অর্থে বস্তুবাদী না হয়েও সমাজ গড়ার কারিগর হিসেবে শ্রমজীবীদের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি ছিল স্পষ্ট। তাই তিনি অকপটে বলেন ঃ "রাখো রে ধ্যান থাক্ রে ফুলের ডালি/ ছিড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধূলাবালি/কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে/ঘর্ম পড়ুক ঝরে।" (গীতাঞ্জলি-২য় খন্ড)

১৯৩২ সালে প্রাদেশিক আইন সভার প্রতিনিধি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের পাশাপাশি, উচ্চ ও নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের মধ্যেও বিরোধ সৃষ্টি হয়। এই সময় সারাদেশে 'নিখিল ভারত অস্পৃশ্যতা নিরোধ সমিতি' গঠিত হয়। অস্পৃশ্যতা বিরোধী এই আন্দোলন রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল। যার ফলশ্রুতিতে তাঁর পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থের 'শুচি', 'মুক্তি', 'প্রথম পূজা' প্রভৃতি কবিতায়, 'রথের রশি' নাটকে এবং চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যে তিনি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ ব্যক্ত করেন।

কবির শান্তিনকেতনে অস্পৃশ্যতা বিরোধী উদ্যোগ শুরু হয়। এই উদ্যোগ সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে, যখন ১৯৩২ সালের ১ ডিসেম্বর সেখানে 'সংস্কার সমিতি' গড়া হয়। ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রীনিকেতনে আয়োজিত অস্পৃশ্যতা বিরোধী জনসভায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আমার লজ্জাবোধ হয় যে, মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে এই সহজ কথাটি এত শাস্ত্রবচন ও তর্ক দিয়ে আমাদের এই দুর্ভাগা দেশকে এখনো বলতে হয়। হাজার হাজার বৎসর ধরে এদের পিছনে ফেলে রেখেছি। সব দেশকে অন্ধকারে মগ্ন করে রেখেছি আমরা শিক্ষিতেরা। .... আজ সময় হয়েছে মিলবার। পুরানো শাস্ত্রের ও কুংসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার দিন চলে গেছে।" (আনন্দবাজার পত্রিকায় এই বক্তৃতা প্রকাশিত হয়)।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'অচলায়তন (১৯১২) নাটকেও অর্থহীন শাস্ত্রবিধি, যুক্তিহীন সংস্কার ও আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্মপালনের বিরোধিতা করেছেন। অচলায়তন একটি প্রাচীন আশ্রম, যা উঁচু প্রাচীর বেষ্টিত এবং বহির্জগতের সাথে সম্পর্কহীন । এই আশ্রমের ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েই সার্থকতাহীন কিছু শাস্ত্রবিধি ও নিয়মের জালে আবদ্ধ।

এই প্রসঙ্গে কবির সুস্পষ্ট অভিমত হলো, "জগতের যেখানেই ধর্মকে অভিভূত করিয়া আচার আপনি বড়ো হইয়া উঠে সেখানেই মানুষের চিত্তকে সে রুদ্ধ করিয়া দেয়—এটা একটা বিশ্বজনীন সত্য।" কিন্তু ঐ গ্রন্থেই লক্ষ্যহীন চক্রকারে আবর্তিত ধর্মীয় কুসংস্কারের তিনি শুধু বিরোধিতাই করেন নি। আশার আলোও দেখিয়েছেন। তাঁর কথায়, "দেশের মধ্যে এমন অনেক আবর্জনা স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে, যাহা আমাদের বুদ্ধিকে শক্তিকে কর্মকে চারিদিকে আবদ্ধ করিয়াছে— সেই কৃত্রিম বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এদেশে মানুষের আত্মা অহরহ কাঁদিতেছে— অচলায়তনে আমার সেই বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে। শুধু বেদনা নয়, আশাও আছে।" আজ যদি রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতেন এবং শুনতেন যে এদেশের শাসকদলের কোন এক প্রতিনিধি একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে এমন কথাও বলেন, গোমূত্র পান করলে ক্যান্সারের ন্যায় দূরারোগ্য ব্যাধির নিরাময় সম্ভব— তাহলে কি বলতেন তিনি?

রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি' নাটকের প্রাথমিক রূপ 'রথ যাত্রা' নামে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়া ভ্রমণে গিয়ে দেখেন সেখানে সমস্ত ধরনের সামাজিক বৈষম্য ও বিভেদকে ভেঙ্গে ফেলে মানুষ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। বিপ্লব-উত্তর রাশিয়ার নবরূপকে দেখে আপ্লুত হয়েছিলেন কবি। তাই ফিরে এসে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে 'রথযাত্রা' নাটকটিকে পরিবর্ধন পরিমার্জন করে 'রথের রশি' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ৫৭ তম জন্মদিনে এই নাটকটি তাঁকে উৎসর্গ করেন। কারণ শরৎচন্দ্রের লেখনীতে বার বার সমাজের লাঞ্ছিত, অবহেলিত মানুষের কথা উঠে আসতো। 'রথের রশি' নাটকে আমরা দেখি পুরুতের চিরাচরিত মন্ত্র, ক্ষত্রিয় রাজার শৌর্য, নর্মদাতীরের এক তথাকথিত সিদ্ধপুরুষ বাবাজির স্পর্শ, বৈশ্য শক্তির প্রতিভূ ধনপতি কারও স্পর্শেই রথ চলল না। এমনকি নারীদের পূজা, অর্চনা, মানত সবকিছুই বৃথা গেল। অবশেষে রথ চলতে শুরু করলো শূদ্রদের হাত যখন রশিতে টান দিল। পুরোহিতের ব্যঙ্গ ও অভিশাপ, সৈনিকের তাচ্ছিল্য এবং নারীদের অনুনয়-বিনয় উপেক্ষা করে অপমানিত, অবহেলিত, লাঞ্ছিত ও শোষিত শূদ্ররা এগিয়ে এল স্তব্ধ রথ অর্থাৎ স্থবির সমাজকে গতিশীল করতে। ভাববাদী কবি প্রথাগতভাবে শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাসী না হলেও, মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যে সামাজিক অচলায়তন ভাঙ্গার কথা বলেছেন, তা কিন্তু শ্রেণী সংগ্রামের বিকাশের এক অপরিহার্য উপাদান। আমাদের দেশে এখনও দেশব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের শ্রেণী ঐক্য গড়ে তুলতে না পারার কারণই হল, সামাজিক কুপমণ্ডুকতাগুলিকে আমরা এখনও অতিক্রম করতে পারিনি। পারিনি বলেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের মতো একটি উগ্র সাম্প্রদায়িক সংগঠনের রাজনৈতিক শাখা বিজেপি রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ যেমন রথের রশি নাটকটি উৎসর্গ করেছিলেন শরৎচন্দ্রকে, তেমনই, 'তাসের দেশ' নাটকটি উৎসর্গ করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসুকে। তিনি সুভাষ বসুকে লিখেছিলেন, 'স্বদেশের চিত্তে নতুন প্রেম সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ করে তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকা উৎসর্গ করলুম' (রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড)। এই নাটকে বংশমর্যাদা, প্রায়শ্চিত্ত বিধি, সংস্কার, শাস্ত্রমতে জাতির উৎপত্তি, রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক আইন প্রভৃতি সমস্ত ধরনের পশ্চাদগামী প্রবণতার বিরোধিতা করা হয়েছে। প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তাস রাজ্যের প্রজাদের দলবদ্ধ মুক্তির বিষয়টিকে।

রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক কবি। কিন্তু রোমান্টিকতাই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। সাধারণ মানুষের সুখে দুঃখে বারবার তাঁর লেখনী সরব হয়েছে। দরিদ্র মানুষের জীবন যন্ত্রণা সম্পর্কে তাঁর প্রথম

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

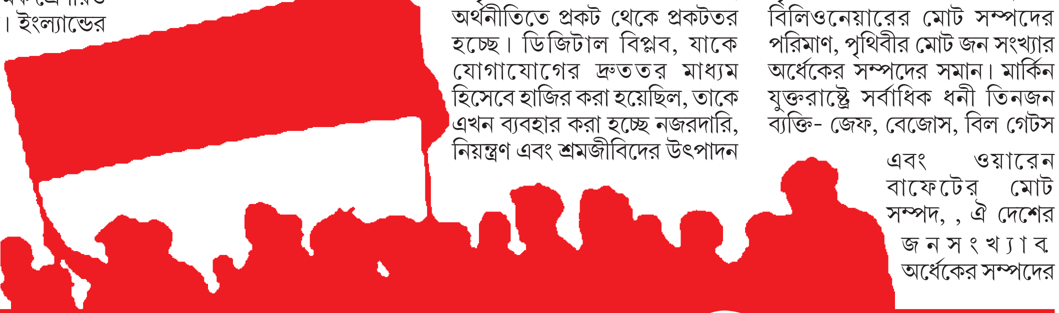

আবহমান মে দিবস

১৮৮৬ সালে শিকাগো শহরের হে মার্কেটের ঘটনা, যাকে 'ঐতিহাসিক মে দিবস'-র সূচনা বিন্দু বলা হয়, তা ১৩৩ বছর অতিক্রম করলো। আর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মে দিবস প্রতিপালনের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্তের কথা ধরলে, মে দিবসের বয়স ১২৯ বছর। এই দীর্ঘ সময় ধরে সারা বিশ্বে শ্রমিক শ্রেণী তথা শ্রমজীবী মানুষ ধারাবাহিকভাবে 'মে দিবস' প্রতিপালন করছেন। কখনোই কোনো কারণে এই প্রক্রিয়ায় ছেদ পড়েনি। এমনকী দুটি বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়েও মে দিবসের দিনে রক্ত পতাকা উত্তোলন করতে শ্রমিক শ্রেণী বিস্মৃত হয়নি। যত দিন গেছে, নতুন নতুন দেশে, নতুন অংশের শ্রমজীবী মানুষ মে দিবসের কর্মসূচীতে শামিল হয়েছেন। আমাদের দেশেও প্রথম মে দিবস প্রতিপালিত হয় মাদ্রাজে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়েই।

তবে 'মে দিবস'-এর তাৎপর্য শুধুমাত্র তার বিস্তৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি আবিশ্ব প্রতিপালিত কোনো আনুষ্ঠানিকতাও নয়। মে দিবসের মূল তাৎপর্য নিহিত এর অন্তর্বস্তুতেই। বরং এভাবেও বলা যায়, অন্তর্বস্তুগত তাৎপর্যই মে দিবসকে আবিশ্ব শ্রমজীবীদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। কি সেই তাৎপর্য সে সম্পর্কে দু'চার কথা বলার আগে বলে নেওয়া প্রয়োজন, মে দিবসের তাৎপর্য কোনো অপরিবর্তনীয় বা স্থিতিশীল দাবিসনদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মে দিবসের দাবি সনদ, পরিস্থিতির ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরনের উপাদান সমূহকে ধারণক্ষম ক্রম পরিবর্তনশীন দাবি সনদ। এই দাবি সনদের আবার দুটি অংশ। একটি সর্বজনীন, সারা বিশ্বের সমস্ত অংশের শ্রমজীবী মানুষের দাবি। অপর অংশটি স্থানিক, মহাদেশ-দেশ-দেশের অভ্যন্তরে রাজ্যভিত্তিক। মে দিবসের কালজয়ী অবিনশ্বরতার অন্তর্নিহিত কারণ এই ঐতিহ্য। মে দিবসের লড়াই (শিকাগো) শুরু হয়েছিল ৮ ঘন্টা কাজের দাবিকে সামনে রেখে। সামান্য মজুরির বিনিময়ে, সূর্যোদয় থেকে সূযাস্ত পর্যন্ত হাড়ভাঙা খাটুনির চাপে পিষ্ট শ্রমিক শ্রেণীর তখন প্রয়োজন ছিল কিছুটা বিশ্রামের সময়। মালিকের মর্জি মাফিক দৈনিক ১৬-১৮ ঘন্টা কাজ করতে হতো শ্রমিক শ্রেণীকে। ফলে সারাদিনের অমানুষিক পরিশ্রমের পর উপযুক্ত বিশ্রাম বা পরিবারের সদস্যদের সাথে কিছুটা সময় কাটানোর কোনো সুযোগই তারা পেতেন না।

যথেচ্ছ পরিশ্রম করিয়ে, মালিক শ্রেণীর চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদনের জন্য শ্রমিকদের বাধ্য করা (প্রয়োজনে ক্লান্ত অবসন্ন শরীরে চাবুক মেরে) ছিল সেই সময়কার উৎপাদন প্রক্রিয়ার দস্তুর। ফলে শ্রমিকরা তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার শোষণমূলক চরিত্রটিকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, এবং তার বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন বিক্ষোভও প্রদর্শন করতেন। হে মার্কেটের ঘটনা তেমনই এক চূড়ান্ত বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার শোষণমূলক চরিত্রটি শ্রমিক শ্রেণীর উপলব্ধির মধ্যে ধরা পড়েছিল পুঁজিবাদের বাহ্যিক রূপটি দেখেই। যদিও মে দিবসের ঘটনার প্রায় আড়াই দশক আগেই মহামতি কার্ল মার্কস তাঁর 'পুঁজি' গ্রন্থে দেখিয়েছেন, কিভাবে একজন শ্রমিক মোট শ্রম সময়ের একটা সামান্য অংশই ব্যয় করেন তাঁর মজুরির জন্য। বাকি সময়টা তিনি শ্রম দেন বিনা মজুরিতে মালিকের স্বার্থে। অর্থাৎ কাজের সময় দু'ঘন্টা কমলেও বা চাবুক মারাটা বন্ধ হলেই যে শোষণ বন্ধ হবে তা কিন্তু নয়। শোষণ বন্ধ হবে তখনই, যখন এই ব্যবস্থারই আমূল পরিবর্তন করা যাবে। কিন্তু মার্কসের এই বিশ্লেষণ তখনও ইউরোপের বাইরে পরিচিতি লাভ করেনি। তাই হে মার্কেটের সংগ্রামরত শ্রমিক বা তাঁদের নেতৃত্বের এই ব্যাখ্যা জানা ছিল না। কিন্তু পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল হে মার্কেটের সমাবেশে ও ধর্মঘটে। এমনকি পার্সনস্, ফিশার, এঙ্গেল প্রমুখ শ্রমিক নেতৃত্ব ফাঁসির আদেশ শোনার পরও অকম্পিত কণ্ঠে যে বক্তব্য রেখেছিলেন, সেই বক্তব্যেও ছিল পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী লড়াই-এর প্রস্তুতি গড়ে তোলার আহ্বান।

কিন্তু ৮ ঘন্টা কাজের দাবির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি মে দিবসের লড়াই। আবার মে দিবসের লড়াই পৃথিবীব্যাপী শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা বিন্দু তাও কিন্তু নয়। শিল্প বিপ্লবের হাত ধরে পুঁজিবাদী উৎপাদন কাঠামো গড়ে ওঠে ইংল্যান্ডে। আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীরও জন্ম প্রথম ইংল্যান্ডেই। ইংল্যান্ডের শ্রমিকশ্রেণীর 'চার্টিস্ট আন্দোলন' নির্দিষ্ট শ্রম সময়ের (১০ ঘন্টা) দাবি আদায়ের পাশাপাশি ভোটাধিকারের মতন রাজনৈতিক দাবিও উত্তাপন করেছিল। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাকে পরিচালনক্ষম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোটি প্রথম গড়ে ওঠে ফ্রান্সে। ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। এই ফ্রান্সেরই প্যারিস শহরে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল (প্যারি কমিউন) শ্রমিক শ্রেণী এবং অল্প কিছুদিনের জন্য (৭১ দিন) হলেও, সেই লক্ষ্যে তাঁরা সফলও হয়েছিল। চার্টিস্ট আন্দোলন বা প্যারি কমিউন হে মার্কেটের ঘটনার পূর্ববর্তী ঘটনা হলেও সেগুলি সংগঠিত হয়েছিল পুঁজিবাদের গর্ভগৃহ ইউরোপ মহাদেশের অভ্যন্তরেই। হে মার্কেটের ঘটনার বিশিষ্টতা হলো ইউরোপের বাইরে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক বিক্ষোভ, ধর্মঘট ও শহীদের মৃত্যুবরণের ঘটনা, যা প্রমাণ করেছিল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রসারের সাথে সমান্তরালভাবে এই ব্যবস্থায় শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনেরও প্রসার ঘটবে। সম্ভবত এই তাৎপর্যকে বিবেচনা করেই, ফ্রেডেরিখ এঙ্গেলস্-এর নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক হে মার্কেটের শ্রমিক আন্দোলনকে স্বীকৃতি দিয়ে, আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস হিসাবে মে দিবসকে প্রতিপালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

কিন্তু সূচনা আট ঘন্টা কাজের দাবিকে কেন্দ্র করে হলেও এর তাৎপর্য এতটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। সময়ের সাথে সাথে সমকালীন পরিস্থিতির উপাদানগুলি সংযোজিত হয়েছে মে দিবসের দাবি সনদে। পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদীস্তরে উত্তরণ, লগ্নী পুঁজির আবির্ভাব, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, বিশ্বযুদ্ধচলাকালীন রাশিয়ার বুকে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠা, বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে বিশ্বব্যাপী আর্থিক মহামন্দা, ফ্যাসিবাদের উদ্ভব, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ফ্যাসিস্ট শক্তির পরাজয়, অর্ধশতাধিক দেশের ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল থেকে মুক্তি, এশিয়া মহাদেশে চীন ও ভিয়েতনামে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠা, হিরোশিমা-নাগাসাকিতে পারমাণবিক বিস্ফোরণ, ঠান্ডা যুদ্ধ, রেগনমিক্স ও থ্যাচারিজমের হাত ধরে নয়া উদারবাদের যাত্রা শুরু, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইওরোপের দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের অবলুপ্তি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক একমেরু বিশ্ব গঠনের উদ্যোগ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য সবকিছুই মে দিবসের সংগ্রামের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। এক কথায় কোনো এক বছরের মে দিবস প্রতিপালন, সমকালীন বাস্তবতা বর্জিত কোনো আনুষ্ঠানিকতা নয়। মে দিবস সমকালীন পরিস্থিতির ইতিবাচক উপাদান ধারণ করে, নেতিবাচক উপাদানগুলির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অপর নাম।

(দুই)

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই এ বছরের মে দিবসের সমকালীন বিশ্ব বাস্তবতার দিকে আমরা চোখ রাখতে পারি।

বিশ্ব বাস্তবতা বলতে আমরা এখানে মূলত বিশ্ব অর্থনীতির হাল হকিকৎ সম্পর্কে আলোচনা করবো। এর সাথে সাযুজ্য রেখে বিশ্ব সমাজনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনগুলি ঘটছে, সেসম্পর্কে পৃথক আলোচনা পরবর্তী কোনো এক সময়ে করা হবে। মে দিবস যেহেতু প্রধানত শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমজীবী মানুষের জীবন-জীবিকার লড়াই, তাই আলোচনার কেন্দ্রে রাখা হচ্ছে বিশ্ব অর্থনীতিকেই। এই মুহূর্তে বিশ্ব অর্থনীতি (যার সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করছে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা) সার্বিক সংকটে নিমজ্জিত। উন্নত, উন্নয়নশীল প্রভৃতি কোনো দেশই এই সার্বিক সংকটের বৃত্তের বাইরে নেই। অর্থনীতির বন্ধাদশা, মানব ইতিহাসের সর্বাধিক অসাম্য, গণবেকারি, ভয়াবহ দারিদ্র, ক্ষুধা প্রভৃতি উপাদানগুলি বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। ডিজিটাল বিপ্লব, যাকে যোগাযোগের দ্রুততর মাধ্যম হিসেবে হাজির করা হয়েছিল, তাকে এখন ব্যবহার করা হচ্ছে নজরদারি, নিয়ন্ত্রণ এবং শ্রমজীবিদের উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বিযুক্ত করার জন্য। অর্থনীতির এই ভয়াবহ সংকট রাজনৈতিক কাঠামোগুলির ওপরেও বিভিন্নভাবে প্রভাব ফেলছে। উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোগুলি দুর্বল হচ্ছে, মাথাচাড়া দিচ্ছে অতিদক্ষিণপন্থী ফ্যাসিবাদী শক্তি, ধর্মীয় মৌলবাদী ও জাতিবাদী শক্তি।

পুঁজিবাদের নয়া উদারবাদী অর্থনৈতিক মডেলে সর্বশক্তিমান হিসেবে বাজার ব্যবস্থাকে হাজির করা হয়েছিল। কিন্তু সেই বাজার এখন বিনিয়োগের অভাবে ধুঁকছে। বিভিন্ন সময়ে আর্থিক বুদবুদ তৈরি করে নির্জীব বাজারকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু বুদবুদ তার ধর্ম অনুযায়ী দীর্ঘস্থায়ী নয়, ফলে ফেটে গেছে এবং বাজার আবারও ধুঁকতে শুরু করেছে। আয় ও সম্পদের ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের কারণে, জনসাধারণের সিংহভাগ অংশের বস্তুগত চাহিদা হ্রাস পেয়েছে, যা আবার বাজার ও বিনিয়োগ উভয়কেই দুর্বল করেছে। উৎপাদন ক্ষমতার বিপুল বৃদ্ধি সত্ত্বেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মতো দেশেও গত চল্লিশ বছরে শ্রমজীবীদের প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধির হার কার্যত যৎসামান্য। শ্রমিক কর্মচারীদের অতিরিক্ত সময় কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে (মে দিবসের লড়াইয়ের বিপরীতমুখী)। কিন্তু নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাগুলিকে দুর্বল করা হচ্ছে। বেকারির যে সরকারি তথ্য বিভিন্ন দেশ থেকে পাওয়া যায়, তা থেকে প্রকৃত অবস্থা বোঝা দুষ্কর। কারণ সরকারীভাবে কর্মনিযুক্তির যে তথ্য হাজির করা হচ্ছে, তার সিংহভাগই চুক্তিভিত্তিক আংশিক সময়ের কাজে নিযুক্ত। অপর্যাপ্ত মজুরি এবং সামাজিক নিরাপত্তহীনতার মধ্যেই এই বড় অংশকে কাজ করতে হয়। শ্রমিক-সংগঠনগুলির দরকষাকষির ক্ষমতাকে কেড়ে নিয়ে, তাদের দুর্বলতর করা হচ্ছে। বর্তমান সময়ে, পৃথিবীর সব থেকে ধনী ৪২ জন বিলিওনেয়ারের মোট সম্পদের পরিমাণ, পৃথিবীর মোট জন সংখ্যার অর্ধেকের সম্পদের সমান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বাধিক ধনী তিনজন ব্যক্তি- জেফ, বেজোস, বিল গেটস এবং ওয়ারেন বাফেটের মোট সম্পদ, , ঐ দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকের সম্পদের থেকে বেশী। গত দু'দশকে পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তেই বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে মাথা পিছু আয় ও সম্পদের নিরিখেও ধনী ও দরিদ্র দেশের মধ্যেও বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রবণতা চিরকালিন হলেও, বর্তমান সময়ে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। সারা বিশ্বের কর্মে নিযুক্ত মানুষের ৬০ শতাংশ, যার সংখ্যা প্রায় ২০০ কোটি, অসংগঠিত ক্ষেত্রে যুক্ত রয়েছেন। বিশ্ব শ্রমজীবীদের বৃহত্তর অংশ এরাই। স্থায়ী, বিধিবদ্ধ কাজে যুক্ত শ্রমজীবী মানুষের তুলনায়, শ্রমের মজুত বাহিনী (বেকার, অর্ধবেকার) সংখ্যায় ৭০ শতাংশ বেশী।

উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের ধনী দেশগুলির অভ্যন্তরেও স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, পবিশ্রুত পানীয় জল, বাসস্থান প্রভৃতি বিষয় ক্রমশ শ্রজীবীদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। বিভিন্ন দেশের শহরগুলির চরিত্রও বদলাচ্ছে। স্বচ্ছল মানুষের ভীড় বাড়ছে শহরগুলিতে, আর অসচ্ছল অংশকে চলে যেতে হচ্ছে শহরতলী বা গ্রামে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন গড়ে ৫ লক্ষ মানুষ খোলা আকাশের নীচে রাত কাটান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ উচ্চ আয়ের দেশগুলিতে মানুষের গড় আয়ুষ্কাল হ্রাস পাচ্ছে। দরিদ্র ও শোষণের সাথে সম্পর্কিত কিছু পুরোনো রোগের পুনরায় প্রাদুর্ভাব ঘটছে। বাত, পীতজ্বর, হুপিং কাশি, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হচ্ছে দরিদ্র মানুষ। কোনো রকম স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়লা শিল্পে শ্রমিকদের মধ্যে যক্ষ্মার আক্রমণ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের এই ভয়াবহ বিপর্যয়কর অবস্থার যদি কোন পরিবর্তন না হয়, তাহলে বর্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই সমস্ত প্রাচীন রোগে মৃত্যুর সংখ্যা, ক্যান্সারের মতন মারণ ব্যাধিত প্রতি বছর যত মানুষ মারা যান, সেই সংখ্যাকেও ছাপিয়ে যাবে।

বহুজাতিক কর্পোরেশনের চাহিদা অনুযায়ী দেশে দেশে নয়া উদারবাদ অনুসরণকারী সরকারগুলি শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে ঢেলে সাজাচ্ছে, যাতে তা শিশুদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের পরিবর্তে, বাজারের প্রয়োজন মেনে আধুনিক প্রযুক্তি পরিচালনক্ষম কিছু পেশাদার কর্মী তৈরী করতে পারে।

বর্তমান পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীদের ওপর আক্রমণের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। নারী শ্রমিকদের বিশেষভাবে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে, শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি করে উদ্বৃত্ত সৃষ্টির উপায় হিসেবে। এই প্রক্রিয়ায় লিঙ্গবৈষম্যেও স্থায়ী চেহারা গ্রহণ করছে। সারা পৃথিবীর নারী শ্রমিকদের এক তৃতীয়াংশেরও বেশী শারীরিক নিগ্রহ অথবা যৌন হেনস্থার শিকার। একচেটিয়া পুঁজি উৎপাদিত পণ্য বাজার দখলের লক্ষ্যে নারী শারীরকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করছে।

কর্পোরেট পুঁজির পক্ষে ন্যায্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গণমাধ্যমের ব্যবহার বহুল চর্চিত। এখন গণমাধ্যমের এই শক্তির সাথে যুক্ত হয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ার প্রচার। বাহ্যিকভাবে এটি স্বাধীন ও সর্বজনীন মনে হলেও, প্রযুক্তি গত কৃৎকৌশলের সাহায্যে মানুষের পছন্দ-অপছন্দ , চাহিদা, ভোগের প্রবণতা প্রভৃতি নিরীক্ষণ করে বিভিন্ন ধরনের মেসেজ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছাড়া হয়, যার অধিকাংশই যাচাই করার কোন সুযোগ থাকে না। এমনকি বিভিন্ন দেশে প্রাক্ নির্বাচনী পর্বে জনমতকে কোন না কোন রাজনৈতিক শক্তির অনুকূলে প্রভাবিত করার মতন প্রযুক্তিগত দক্ষতা রয়েছে— এমন দাবি করা বহু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, যারা সর্বোচ্চ মূল্য প্রদানকারীর পক্ষে ভূমিকা পালন করে।

বিভিন্ন দেশের নির্বাচনকে কর্পোরেট ও শতকোটিপতিদের কালো টাকা প্রভাবিত করছে। স্বভাবতই যাঁরা মন্ত্রিসভায় স্থান পাচ্ছেন তাদেরও একটা বড় অংশ কর্পোরেট লবির লোক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্প মন্ত্রিসভায় ৭২ শতাংশ কর্পোরেট দুনিয়া থেকে এসেছেন।

বর্তমান বিশ্বে আর একটি রূঢ় বাস্তবতা হল 'যুদ্ধ', যার অধিকাংশের পেছনেই রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ প্ররোচনা। বিশেষত খনিজ তেল সমৃদ্ধ অঞ্চল, যেমন মধ্যপ্রাচ্য এই ধরনের যুদ্ধ চক্রান্তের শিকার হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে দেশগুলির সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে, সে দেশগুলি হল আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া, ইয়েমেন, সোমালিয়া প্রভৃতি। এর বাইরেও রাশিয়ার সাথে এক নতুন ঠান্ডা যুদ্ধ এবং চীনের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করা মার্কিন রণনীতির অঙ্গ।

বিভিন্ন দেশের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ চাপিয়ে দেওয়াও মার্কিন আগ্রাসী বিদেশনীতির পরিচয়। ভেনেজুয়েলা, নিকারাগুয়া, ইরান, প্রভৃতি দেশের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক অবরোধ চাপিয়ে দিয়েছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের আরও একটি বহিঃপ্রকাশ ঘটছে অভিবাসন সমস্যার মধ্যে দিয়ে। এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীতে অভিবাসী মানুষের সংখ্যা ২৫ কোটি। এমনকি উন্নত দেশগুলির মোট জনসংখ্যার ১৪ শতাংশ অন্য দেশে পারি দিতে

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে

দুই বিপদ ঃ কৃষি সংকট ও কর্মহীনতা

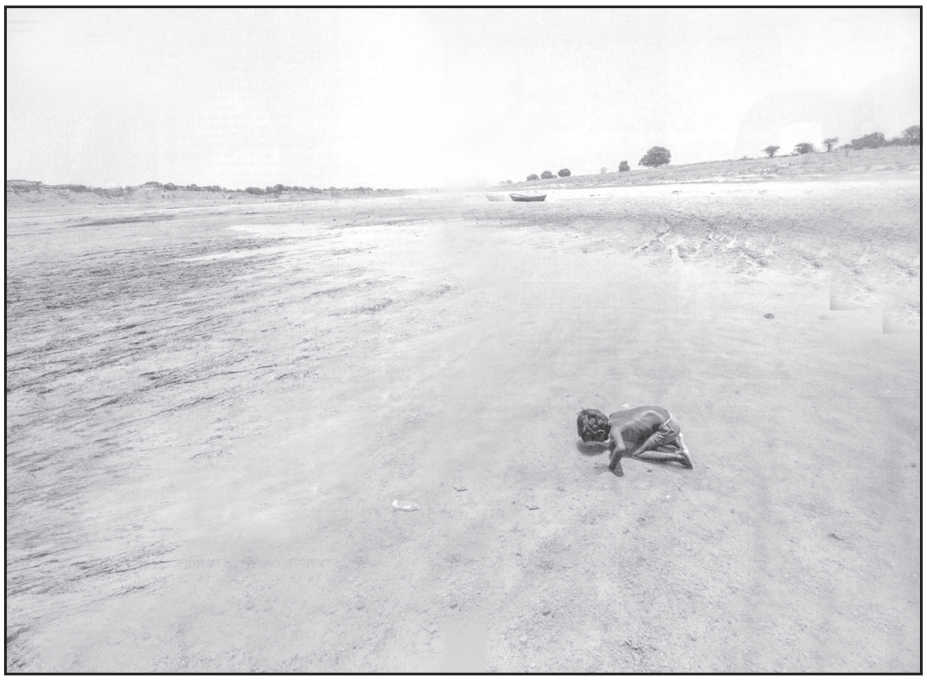

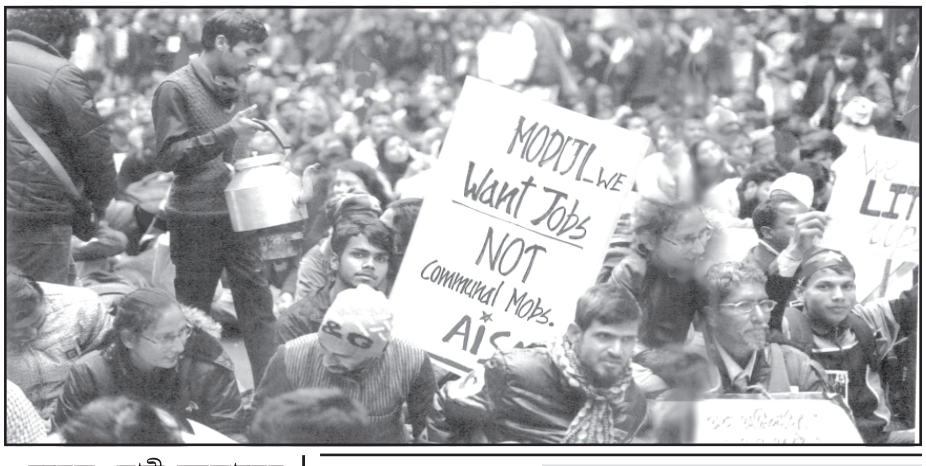

নরেন্দ্র মোদী সরকারের প্রথম পাঁচ বছরে এই দুই সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। অথচ নির্বাচনী প্রচারে প্রধানমন্ত্রী অথবা তাঁর পারিষদবর্গ এনিয়ে একটি কথাও বলেননি। কিন্তু নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর, প্রকাশিত বিভিন্ন সরকারী পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে এই দুটি সমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। শ্রীমোদীজি আগামী পাঁচ বছর এ বিষয়ে কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন কি?

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

বিশ্বকবির প্রতিবাদী চেতনা ও আমাদের শিক্ষা

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে শিলাইদহ, সাজাদপুর ও পতিসরে জমিদারি তদারকি করতে গিয়ে। ১৮৯৪ সালে 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় তিনি লেখেন — 'বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা— সম্মুখেতে কষ্টের সংসার/বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার। /অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু, / চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু / সাহস বিস্তৃত বক্ষপট।' তাছাড়াও 'পুরাতন ভৃত্য' (১৮৯৫), 'দুই বিঘা জমি' (১৮৯৫) কবিতায় এবং ' গোরা' (১৯১০) উপন্যাসে অসহায়, নিপীড়িত মানুষের প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে। 'অপমানিত' (১৯১০) কবিতায় সমাজের নীচু তলার মানুষদের অপমান ও অবহেলা করার যে অভ্যস্ততা উঁচু তলার গর্বান্ধ মানুষের ছিল, তাকে কটাক্ষ করে কবি লিখলেন, 'যারে তুমি নিচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে ...।' ধূলামন্দির (১৯১০) কবিতায় ধূলাবালিতে কর্মরত চাষিদের সাথে একাত্মতা বোধ করে কবি বলছেন, 'কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে।' আবার নভেম্বর বিপ্লবের (১৯১৭) অব্যবহিত পরেই তাঁর রচিত 'বিজয়ী' কবিতায় (১৯১৮) সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে মানবমুক্তির প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াকে দেখে তিনি তীর্থস্থান দর্শনের আনন্দ পেয়েছিলেন। কিন্তু 'সাত মাস আমেরিকায় ঐশ্বর্যের দানবপুরীতে' কাটাবার (১৯২১) অভিজ্ঞতা ছিল ঠিক বিপরীত। তাঁর পুঁজিতান্ত্রিক আমেরিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করেছেন এভাবে ঃ 'লক্ষ্মী হলেন এক, আর কুবের হল আর — অনেক তফাৎ। লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি কল্যাণের, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রীলাভ করে। কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাভ করে। বহুলত্বের কোনো চরম অর্থ নেই' (শিক্ষার মিলন, রবীন্দ্র রচনাবলী, একাদশ খণ্ড) মার্কস কথিত পুঁজির আদিম সঞ্চয় প্রক্রিয়াকে, কবি তাঁর ভাষায় কুবেরের ধনসংগ্রহ বলে উল্লেখ করেছেন। ভাষা যাই হোক, এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তিনি পুঁজিবাদের শোষণের স্বরূপটিকে উপলব্ধি করেছিলেন। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। তাই সমবায় প্রবন্ধে (১৯২৩) তিনি লেখেন, 'যেখানে মূলধন ও মজুরির মধ্যে অত্যন্ত ভেদ আছে, সেখানে ডিমক্রাসি পদে পদে প্রতিহত হতে বাধ্য। কেননা সকলরকম প্রতাপের প্রধান বাহক হচ্ছে অর্থ। সেই অর্থ অর্জনে যেখানে ভেদ আছে সেখানে রাজপ্রতাপ সকল প্রজার মধ্যে সমানভাবে প্রবাহিত হতেই পারে না।' এই অংশটুকু পড়লেই বোঝা যায় শ্রেণী-দ্বন্দ্ব তাঁর কাছে কোনো অপরিচিত বিষয় ছিল না। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার শোষণমূলক চরিত্রকে আরও স্পষ্টাভাষায় তিনি নিন্দা করেন। তাঁর পল্লীকথা প্রবন্ধে (রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৯৩৪)— 'বর্তমান সভ্যতায় দেখি, এক জায়গায় একদল অন্ন-উৎপাদনের চেষ্টায় নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে, আর এক জায়গায় আর একদল মানুষ স্বতন্ত্র থেকে সেই অন্নে প্রাণ ধারণ করে। চাঁদের যেমন এক পিঠে অন্ধকার অন্য পিঠে আলো, এ সেইরকম। একদিকে দৈন্য মানুষকে পঙ্গু করে রেখেছে— অন্যদিকে ধনের সন্ধান, ধনের অভিমান, ভোগবিলাস সাধনের প্রয়াসে মানুষ উন্মত্ত।'

গত শতাব্দীর ত্রিশের দশকে পুঁজিবাদ প্রথম মহাসঙ্কটে নিমজ্জিত হয়। এর প্রভাব পড়ে এদেশের শিল্পেও। চটকল মালিকরা তাদের মুনাফার বৃদ্ধিকে সুনিশ্চিত করতে শ্রমিক ছাঁটাই ও শ্রমিকদের মজুরি হ্রাসের চিরাচরিত পথ গ্রহণ করে। এর প্রতিবাদে চটকল শ্রমিকরা ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে লাগাতার ধর্মঘটে শামিল হয়। রবীন্দ্রনাথ চটকল শ্রমিকদের এই ধর্মঘটকে সমর্থন করেন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাবেদর ৩০ এপ্রিল 'দি হিন্দু' পত্রিকায় তাঁর বিবৃতি প্রকাশিত হয় ঃ 'গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে যে হাজার হাজার চটকল শ্রমিক ধর্মঘট করেছেন, তাদের দুর্দশা-দুর্ভোগের বৃত্তান্ত জেনে আমি গভীরভাবে বিচলিত বোধ করছি।... তাদের মজুরি বৃদ্ধি ও কাজের মানবিক পরিবেশ-পরিস্থিতির উন্নয়নের দাবিতে যে আন্দোলন চলছে, তা ন্যায্য এবং যুক্তি সঙ্গত। ... মন্ত্রিসভার কাছে কি আমরা আশা করতে পারি না যে, তারা হাজার হাজার শ্রমিক ও তাদের পরিবার বর্গের জীবন-বিপন্নকারী এই সমস্যাটির দিকে দৃষ্টিপাত করবেন এবং অবিলম্বে তাদের প্রতি যাতে সুবিচার হয়, সেটাও দেখবেন? সমাজের বোঝা যাঁরা বহন করছেন, সেই শ্রমজীবী মানুষের নিরাপত্তা ও দেখাশোনার দায়িত্ব সমাজকেই নিতে হবে। এটাই তো মানবতার দাবি। এই যন্ত্রণা ও বিপদের দিনে চটকল শ্রমিক এবং তাদের অসহায় নারী ও ছেলে মেয়েদের সাহায্য দানের জন্য আমি আমার দেশবাসীর উদ্দেশে আবেদন জানাচ্ছি।' শ্রমজীবী মানুষের প্রতি কবির মমত্ববোধ প্রকাশ পায় 'ওরা কাজ করে' (১৯৪১) কবিতায় — 'শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে / ওরা কাজ করে।'

শ্রমিক ও কৃষকের কথা তাঁর লেখনীতে বার বার উঠে এলেও তাঁরা মনে সংশয় ছিল, হয়তো বা তাঁদের জীবন যন্ত্রণার কথা তিনি সবটা বলতে পারেননি। তাই ঐকতান (১৯৪১) কবিতায় তিনি লিখলেন, 'কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন, / কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন / যে আছে মাটির কাছাকাছি / সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।' সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি তাঁর সুগভীর মমত্ববোধ ঝরে পড়ে এমনকি জীবনের একেবারে শেষ পর্বেও— ' মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, /আমি তোমাদেরই লোক/ আর কিছু নয় — / এই হোক শেষ পরিচয়।' (সেঁজুতি, রবীন্দ্র রচনাবলী ৩য় খণ্ড)।

'ভূমিলক্ষ্মী' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'চাষী বলছে, চাষের কাজ থাকলেও হিসাব করিয়া দেখিয়াছি চাষে আমাদের কুলায় না।' চাষির এই কষ্টের কারণ বিশ্লেষণ করে তিনি বললেন, 'গ্রাম্যতার গণ্ডির মধ্যে ফিরে গিয়ে চাষির সংসার কুলাবার রাস্তা খুঁজে পাওয়া যাবে না' তাহলে কুলাবার পথ কি? তিনি বললেন, 'অন্যতম পথ যন্ত্রশক্তিতে শক্তি সত্তা, কলকারখানার উদ্ভব এক আধুনিক শিল্পায়ন ও প্রযুক্তির যথোচিত চর্চা ও তার সদ্‌ব্যবহার।' সাম্প্রতিককালে আমরা যেমন সিঙ্গুরকাণ্ড দেখেছি, তেমনি সেই সময়েও 'বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল', ' মোহিনী মিল' প্রভৃতি নবগঠিত কারখানা হটাবার চেষ্টা হচ্ছিল। এর বিরুদ্ধে তিনি বাংলার মানুষকে ডাক দিলেন— 'কারখানা যেমন করে হোক রক্ষা করতে হবে— বাঙ্গালির উপর এই দায় রয়েছে।' তিনি বুঝেছিলেন চাষিদের বোঝানো খুব প্রয়োজন, কারণ জমির সঙ্গে চাষির নাড়ির টান। তাই চাষিদের বোঝানোর দায়িত্ব নিয়ে তিনি বললেন, 'জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি। আহার তিনি দেন না, যদি স্বহস্তে আহারের পথ তৈরি না করি। আজ এই কলের যুগে কলই সেই পথ।'

রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ না করলেও দেশের ও বিশ্বের বিভিন্ন রাজনৈতিক সঙ্কটে তিনি কখনও নীরব থাকেন নি।

তাঁর কথায়, 'অনেক রাষ্ট্রনায়কদের বলেছিলুম, দেশের বিরাট জনসাধারণকে অন্ধকার নেপথ্যে রেখে রাষ্ট্ররঙ্গভূমিতে যথার্থ আত্মপ্রকাশ চলবে না। দেখলুম সে কথা স্পষ্ট ভাষায় উপেক্ষিত হল। সেই দিনই মনে মনে স্থির করেছিলুম কবি কল্পনার পাশে এই কর্তব্যকে স্থাপন করতে হবে, অন্যত্র এর স্থান নেই।'

১৯৪১ সালে 'দি মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সেপ্টেম্বর সংখ্যায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রশ্নোত্তরে রবীন্দ্রনাথের কিছু মতামত প্রকাশ করেন। এর মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল — Who is the greatest king? রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিয়েছিলেন— 'The people'।

এক কথায় অনেক 'নেতি' ও 'ইতি'-র দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সমাজ, দেশ, বিশ্ব রাজনীতি, মানুষ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা আধুনিকতার অভিমুখে বিবর্তিত হয়েছে। ঠিক যেমনটা হয়েছিল টলস্টয়ের ক্ষেত্রে।

উপসংহার ঃ বিশ্বকবি আমৃত্যু যে কুপ্রথাগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, সেগুলি আজও সক্রিয়। তা পুঁজির শোষণ হোক, বা ধর্মান্ধতা ও সামাজিক কুপ্রথা। তাই আজকের লড়াইয়ে প্রতি পদক্ষেপে রবীন্দ্রনাথ হবেন আমাদের প্রেরণা। □

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আবহমান মে দিবস

বাধ্য হয়েছে।

পৃথিবীর জনসংখ্যার ১০ শতাংশ এই মুহূর্তে পুষ্টির অভাবে আক্রান্ত। খাদ্য-শস্যের সংকটের কারণে বিভিন্ন দেশে সস্তায় পচনশীল খাদ্য-শস্যের ব্যবসা চালু হয়েছে যা মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই ১ কোটি ৩০ লক্ষ শিশুর খাদ্য নিরাপত্তা নেই। গোটা পৃথিবীজুড়েই বস্তীবাসী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পুঁজিবাদী মুনাফাকাঙ্খী আগ্রাসী নীতির আরও একটি বহিঃপ্রকাশ হল আবহাওয়ার পরিবর্তন। প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা বলছেন, যেভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শিল্পোন্নত দেশগুলির এ বিষয়ে উদাসীনতার কারণেই অদূর ভবিষ্যতে এ পৃথিবীএকটি উত্তপ্ত গ্রহে পরিণত হবে। পরবর্তী পর্বে জলবায়ুর যে ভয়ঙ্কর বিপর্যয়কর পরিবর্তন ঘটবে তাকে আর সংশোধন করার আর কোনো সুযোগ থাকবে না।

এককথায় বলা যায় একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবী আমাদের সামনে হাজির করেছে যুদ্ধের বিপদ, প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার, মানবসম্পদের অপচয় এবং প্রকৃতির আবহাওয়ার ধ্বংসসাধন। স্বভাবতই মে দিবসের লড়াই যখন শুরু হয়েছিল, তার পর থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভুতপূর্ব অগ্রগতি ঘটেছে। বিপুল বৃদ্ধি পেয়েছে উৎপাদনের ক্ষমতা। কিন্তু হে মার্কেটের শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকার সমস্যা এবং আজকের এই একবিংশ শতাব্দীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা অন্যান্য উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকার সমস্যা প্রায় একই। এর কারণ হল অগ্রগতির সুফলটুকু ভোগ করেছেন মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ। যাঁরা উৎপাদনের উপকরণের মালিক। তাই মে দিবস বিংশশতাব্দীতে যে সমাজ পরিবর্তনের বার্তাকে নিজের দাবি সনদে অন্তর্ভূক্ত করেছিল, একবিংশশতাব্দীতে তা একই রকম প্রাসঙ্গিক। এই লক্ষ্যেই আবিশ্ব শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমজীবী মানুষ লড়াই জারি রাখবেন— এই হোক এবারের মে দিবসের শপথ। □

সুমিত ভট্টাচার্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কার্যনির্বাহী কমিটির সভা

সভাপতি রবিনডাল হাটুরা সকলকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় সাধারণ সম্পাদক এ শ্রীকুমার প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন। তিনি আন্তর্জাতিক, জাতীয় পরিস্থিতি ও সাংগঠনিক করণীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি উল্লেখ করেন। তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিস্থিতি সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করেন। দেশের লোকসভা নির্বাচন ও তার ফলাফলসহ পরিস্থিতিতে আগামীদিনে শ্রমিক কর্মচারীদের ভূমিকা ও দায়িত্ব কর্তব্যসহ করণীয় বিষয়গুলি উল্লেখ করেন। দেশের ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক শক্তির বক্তব্য, দেশের ঐক্য ও সংহতি, জীবন জীবিকার প্রশ্নকে পিছনে ঠেলে দিয়ে সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী যুদ্ধ জিগিরের ভাষ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে দেশের উগ্র দক্ষিণপন্থী শক্তি। আগামী দিনে শ্রমিক কর্মচারী স্বার্থে ও দেশের ঐক্য ও সংহতির লক্ষ্যে লড়াই জারি থাকবে। রাজ্যে রাজ্যে কর্মচারীদের ও সাধারণ মানুষের স্বার্থে লড়াই সংগ্রাম চলবে।

এছাড়া দিল্লীর গৃহ ক্রয় তহবিল ১৫ জুলাই ১৯-র মধ্যে জমা দেওয়ার জন্য বলেন এবং পরবর্তী সময়ে ক্রয় করার কথা উল্লেখ করেন। হোয়াটস্‌অ্যাপ গ্রুপ করা হয়েছে এবং কাজের অনেক সুবিধা হচ্ছে বলে জানান। রাজ্যে রাজ্যে সাংগঠনিক অবস্থা ও করণীয় সম্পর্কে বক্তব্যে উল্লেখ করেন। পশ্চিমবাংলার রাজ্য সরকারের আক্রমণ দূর দূরান্তে বদলী করা সত্ত্বেও সংগঠনের উদ্যোগে লড়াই সংগ্রাম লাগাতার চলেছে, তা সংগঠনের কাছে উদাহরণ হিসেবে ব্যক্ত করেন। এছাড়া সংগঠন ও গৃহ ক্রয় তহবিল দ্রুততার সাথে জমাসহ সাংগঠনিক অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সহ এমপ্লয়িজ ফোরামের গ্রাহকভুক্তি করা শুরু করার জন্য বলেন।

সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাবনার উপর ও মহিলা সেশনে দু'দিন ধরে ৯ জন মহিলাসহ ২৫ জন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে বিশ্বজিৎ গুপ্তচৌধুরী ও সুতপা হাজরা। সভার দ্বিতীয় দিনের শুরুতে চণ্ডীগড় ইউনিটের সভাপতি সুনীল যোশি সভায় অভ্যর্থনা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। এরপর জবাবী বক্তব্য রাখেন এ শ্রীকুমার। সভায় পশ্চিমবাংলা থেকে সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ উপস্থিত ছিলেন। সভা পরিচালনা করেন সর্বভারতীয় চেয়ারম্যান এস লাম্বা।

এই সভা থেকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

১। আগামীতে রাজ্যে রাজ্যে কর্মচারীদের ও সাধারণ মানুষের স্বার্থে লড়াই আন্দোলন জারি রাখতে হবে।

২। দিল্লীতে হেড কোয়ার্টার্স বিল্ডিং ক্রয় করা চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেওয়া হয় এবং অবিলম্বে বকেয়া নির্ধারিত টাকা জমা দিতে বলা হয়।

৩। সর্বভারতীয় ন্যাশনাল কাউন্সিল সভা মহারাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হবে। ১০ জন করে প্রতিনিধি থাকবেন। ২৫ শতাংশ মহিলা প্রতিনিধি হবেন।

৪। সদস্য পিছু দু টাকা হারে তহবিল জমা দিতে হবে।

৫। এমপ্লয়িজ ফোরামের গ্রাহক অর্থ জমা দিতে হবে। রাজ্যে রাজ্যে পৌছানোর সমস্যা মোকাবিলা করা হবে।

৬। পরবর্তী কার্যনির্বাহী কমিটির সভা ২১-২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পাঞ্জাবের জলন্ধরে অনুষ্ঠিত হবে। □

বৃহৎ পুঁজির নিয়ন্ত্রণে গণমাধ্যম ঃ কিছু কথা

অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী

বিশিষ্ট সাংবাদিক অনিরুদ্ধ চক্রবর্তীর এই লেখাটি ষোড়শ রাজ্য সম্মেলন (২০১০) উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সংগ্রামী হাতিয়ার বিশেষ সংখ্যা থেকে নেয়া হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে লেখাটির প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা করে পুনর্মুদ্রন করা হলো।

বেশ কিছুদিন আগে নামী সংবাদপত্রের এক নামী সাংবাদিক বন্ধু বলেছিলেন, তোরা যাই বলিস আজ পর্যন্ত আমার কাগজে আমার লেখা কখনই একেবারে কেটে উড়িয়ে দেয়নি, অথবা কখনও বলেনি অমুক বিষয়ে এক লাইন লেখা যাবে না। লেখার ব্যাপারে আমার পুরদস্তুর ফ্রিডম আছে।

যখন তিনি একথাটি বলেছিলেন, তার অল্প কিছুদিন আগেই জামশেদপুরে টাটা কোম্পানির কারখানায় একটি আগুন লাগে। ৫০ জনের বেশি কর্মী মারা যান। অথচ তাঁর সেই কাগজে খবরটি দু'চার লাইনে কোনমতে ছাপা হয়েছিল। সাধারণত এ ধরনের আগুনের ঘটনা ঘটলে অন্তত তিন চারদিন ধরে তদন্তমূলক খবর ছাপা হয়ে থাকে। কিন্তু জামশেদপুরের আগুন সম্পর্কে আর একটি বাধ্যকও ছাপা হয়নি। সেই সাংবাদিক বন্ধুটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, জামশেদপুরের আগুন নিয়ে যদি তুই লিখতে চাইতিস তাহলে কি তোর কাগজে তোকে লিখতে দিত?

এ প্রশ্ন শুনে তিনি আমতা আমতা করতে থাকলেন। কোনও স্পষ্ট জবাব দিতে পারলেন না। সত্যি কথা বলতে কি আমার সেই সাংবাদিক বন্ধুটি হলেন আদতে এক অত্যন্ত বুদ্ধিমান সাংবাদিক। আসলে তিনি ভাল করেই জানেন, তাঁর কাগজে একটা পলিসি বা নীতি আছে। তিনি জানেন, কোন খবর ছাপা হবে আর কোনটা ছাপা হবে না। হয় তিনি সেই নীতিতে নিজেও বিশ্বাসী অথবা কাগজের নীতি অনুগতের মত মেনে চলেন। মেনে চললে কোনও সংঘাতের রাস্তা নেই, লেখা কেটে উড়িয়ে দেবার সম্ভাবনাই নেই।

সাংবাদিদের স্বাধীনতা নিয়ে সাংবাদিকতা পাঠক্রমে অনেক উচ্চ আদর্শের কথা বলা হয়ে থাকে। কথাগুলি যে সম্পূর্ণ মূল্যহীন তা বলছি না, কিন্তু এই স্বাধীনতা আসলে সাংবাদিকের নয়। অন্তত বৃহৎ সংবাদপত্র বা গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে তো নয়ই। বস্তুত এই স্বাধীনতা আসলে সংবাদপত্র বা গণমাধ্যম মালিকের। মালিকের যে নীতি তার বৃত্তের মধ্যেই সাংবাদিক তাঁর 'স্বাধীনতা' ভোগ করেন।

প্রশ্ন হলো সংবাদপত্র বা গণমাধ্যমের নীতি ঠিক হয় কীভাবে? একটি প্রতিষ্ঠান কোন রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করবে কেবলমাত্র সেটাই বিষয় নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরো বৃহত্তর প্রশ্ন।

আশির দশক থেকে পৃথিবীর নানা দেশে যে উদার অর্থনীতি বা বাজার অর্থনীতির ফলে কাঠামোগত সংস্কারনীতি চালু হয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পরে তা বাড়তি মাত্রা পায়। বিশ্বের রাজনৈতিক ভারসাম্য সাম্রাজ্যবাদের অনুকূলে ঝুঁকে পড়ে। ভারতেও ১৯৯১ সাল থেকে নয়া আর্থিক সংস্কারনীতির প্রয়োগ শুরু হয়। দুনিয়া জুড়ে গণমাধ্যমে এই নীতির সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। এই নীতির সমর্থনে Consensus বা সর্বসম্মতি হয়েই গেছে এমন একটি ধারণা জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়।

বস্তুত আজকের বাজার অর্থনীতিতে গণমাধ্যম দু'টি প্রধান ভূমিকা পালন করছে। তারা বিনিয়োগ ও বাজারের জন্য তথ্য সরবরাহ করে। বাজার অর্থনীতিকে সচল রাখতে গণমাধ্যম ""গ্রিজ"-এর কাজ করে। এই মুহূর্তে বাজার অর্থনীতির অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে গণমাধ্যম। তারা ক্রেতার চাহিদা বাড়াতে ভোগবাদের প্রসার ঘটাচ্ছে, বাজার অর্থনীতির চাকাকে ঘুরতে সাহায্য করছে। দ্বিতীয়ত গণতন্ত্রের সেবক হিসাবে গণমাধ্যমের বহু-আলোচিত ভূমিকা খর্ব হচ্ছে। জনস্বার্থবাহী সাংবাদিকতা দিন দিন পিছু হটছে। জনজীবনের সমস্যা বা সংকটের মূলে না যাওয়া, বিতর্ককে এড়িয়ে যেতে তারা সজাগ। যেমন এ প্রশ্ন কোন বৃহৎ সংবাদপত্র কিম্বা টেলিভিশন চ্যানেল তোলে না যে ভারতে বিভিন্ন বৃহৎ বেসরকারী সংস্থার কাছে ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বকেয়া ঋণের পরিমাণ ১ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে।

একথা অস্বীকার করা যায় না আজ সংবাদ জগতের যে বিপুল ব্যাপ্তি আমরা দেখতে পাচ্ছি তার জন্ম বুর্জোয়া সমাজের গর্ভেই। কখনও কখনও 'বুর্জোয়া' শব্দটিকে গাল পাড়তে ব্যবহার করা হয় বটে, তবে বুর্জোয়া তো আসলে এক শ্রেণি। ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব ছিল বুর্জোয়া বিপ্লব। এই বিপ্লব সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আদর্শকে সামনে এনেছিল। এই আদর্শের প্রেক্ষাপটেই গণতন্ত্রের সেবক হিসাবে সংবাদপত্রের আবির্ভাব। অবশ্যই মূদ্রণ শিল্পের আবির্ভাব সংবাদপত্র প্রসারে সাহায্য করেছিল। প্রায় একই সঙ্গে আমেরিকায় সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। সেইসময় মার্কিন সংবিধান প্রণেতাদের আশঙ্কা ছিল যদি মত প্রকাশের স্বাধীনতা সংবিধানেই অন্তর্ভুক্ত না করা হয় তবে শাসকদলের স্বেচ্ছাচারে বিরোধীরা কোণঠাসা হয়ে যাবে।

এখন হয়ত ভাবতে অবাক লাগবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার অধিকাংশ সংবাদপত্রই ছিল কোন দল, গোষ্ঠী বা পক্ষভুক্ত। নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার ধারণা তখনও তৈরি হয়নি। ১৯০০ সাল পর্যন্ত আমেরিকাতেও সাংবাদিকতার কোন কোর্স চালু ছিল না। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আরো অন্যান্য ক্ষেত্রের মত সংবাদপত্র জগতেও একচেটিয়া ব্যবসা শুরু হয়। যাঁরা সংবাদপত্র শিল্পে টাকা ঢেলেছিলেন, তাঁরা বুঝেছিলেন নিরপেক্ষতার মোড়কে যদি সংবাদ পরিবেশন করা যায়, তবে সংবাদপত্র বিকোয় বেশি। ১৯১৫ সালে এসে দেখা গেল আমেরিকার প্রতিটি বড় শহরে সাংবাদিকতার কোর্স চালু হয়েছে। অর্থাৎ সংবাদপত্র ততদিনে শিল্পে পরিণত হয় এবং তা ক্রমে বৃহৎ পুঁজির দাসে পরিণত হয়। মনে রাখতে হবে, প্রায় একই সময়ে জনসংযোগ বিদ্যার আবির্ভাব—যার প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল সুকৌশলে বেসরকারী পুঁজির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা, জনমনে তার বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করা।

বিশিষ্ট গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ বরার্ট ডব্লিউ ম্যাকবেসনি দেখিয়েছেন, আশির দশকে আমেরিকার গণমাধ্যম জগতে মালিকানা নিয়ন্ত্রণ আইন শিথিল করা হয়। আজ কেবলমাত্র সাতটি বা আটটি প্রতিষ্ঠান আমেরিকার গণমাধ্যম জগৎ নিয়ন্ত্রণ করে। সেখানকার সব গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র স্টুডিয়ো, সংগীত কোম্পানী, টেলিভিশন নেটওয়ার্ক, কেবল্ টিভি এবং আরো বহু কিছুই তাদের মালিকানাধীন। ১০টি বহুজাতিক সংস্থা উত্তর আমেরিকার ও পশ্চিম ইউরোপের গণমাধ্যমকে দখলে নিয়ে নিয়েছে। এর পরিণতি কী হয়েছে? ১৯৪০ থেকে ১৯৫০-এর দশক পর্যন্ত আমেরিকার শত শত পূর্ণ সময়ের সাংবাদিক পাওয়া যেত, যাঁরা Labour bit বা শ্রম সংক্রান্ত খবর সংগ্রহেই বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁরা যে সবসময়ে শ্রমিকের পক্ষে লিখতেন এমন নয়, কিন্তু সংবাদপত্রে শ্রম-সংক্রান্ত খবর গুরুত্ব পেত। আজ কিন্তু সেই Labour bit উঠে গিয়েছে। আজ সে দেশের বৃহৎ সংবাদপত্রের বেশিরভাগ সাংবাদিকই মনে করেন, গরিব মানুষ, সংখ্যালঘু, শ্রমজীবী মানুষের সমস্যার কথা আর সাংবাদিকতার বিষয়বস্তু হতে পারে না। ১৯৯৯-২০০০ সালে সিয়াটল এবং ওয়াশিংটন ডিসিতে বিশ্বব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের বৈঠকের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভের খবরকে গুরুত্ব না দিয়ে ফলাও করে ছাপা হয়েছিল জুনিয়র জন কেনেডির বিমান দুর্ঘটনার খবর। খবরে বিক্ষোভ চলাকালীন সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি অথবা হিংসার বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হল, কিন্তু পুলিশের ভূমিকাকে আড়াল করা হল। হাতে গোনা কয়েকটি রিপোর্টে সঠিক সংবাদ প্রকাশিত হলেও তা হাজারটা খবরের ভিড়ে হারিয়ে গেল।

এর পাশাপাশি আমরা ভারতীয় সংবাদজগতের প্রসঙ্গটি সংক্ষেপে আলোচনা করে নিতে পারি।

স্বাধীনতা আন্দোলনে এদেশের সংবাদপত্র তথা সাংবাদিকতার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। বস্তুত জাতীয় স্তরের এমন কোন রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, যাঁরা কোন না কোন সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। গান্ধীজী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, সুভাষচন্দ্র বসু প্রত্যেকেই পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সংবাদপত্রের কার্যালয়গুলি ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের এক একটি কেন্দ্র বিশেষ। অর্থাৎ তখন সাংবাদিকতা ছিল একটি মিশন বা ব্রত। দেশের স্বাধীনতার জন্য, মুক্তি সংগ্রামের জন্য মানুষকে উদ্দীপিত করার কাজেই নিয়োজিত ছিল সংবাদপত্র।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অবস্থা এক জায়গায় থাকেনি। সংবাদপত্র ব্রত থেকে বৃত্তিতে পরিণত হল। সংবাদপত্র হয়ে দাঁড়াল একটি শিল্প, যা থেমে মুনাফা আসে। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেল বলেছিলেন, দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে। এই স্বাধীন সরকারকে সমর্থন জোগানোই সংবাদপত্রের দায়িত্ব, তার বিরোধিতা করা নয়। এই বাতাবরণে সংবাদপত্রের একটা বড়ো অংশ জনজীবনের মৌলিক সমস্যাগুলি নিয়ে প্রশ্ন না তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। একটা সময়ে ভি কে কৃষ্ণমেনন ভারতীয় সংবাদপত্রকে Jute Press বা চটকল মালিকদের সংবাদপত্র বলে বর্ণনা করেছিলেন। কারণ কিছু সংবাদপত্রে চটকল মালিকদের বক্তব্যই বেশি স্থান পেত। তথাপি একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, এদেশে সংবাদকত্রের চরিত্র বদল ঘটলেও স্বাধীনতা উত্তরকালে ভারতে গণতন্ত্র সম্প্রসারিত করার কাজে সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। একাজে অজস্র সাংবাদিক, সংবাদপত্রকর্মী এবং কিছু কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে সংবাদপত্র মালিকও পাঠকের কাছে প্রকৃত তথ্য পৌঁছে দিতে প্রয়াসী থেকেছেন। ফলে শাসনকর্তাদের রোষানলেও পড়তে হয়েছে। জরুরী অবস্থা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আবার সেই জরুরী অবস্থা প্রত্যাহৃতও হয়েছে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কিন্তু অবস্থা এক জায়গায় থেমে থাকেনি। নব্বইয়ের দশকে ভারত বাজার অর্থনীতির যুগে প্রবেশ করে। তখনই দেখা গেল বৃহৎ সংবাদকত্র তথা প্রচারমাধ্যম বাজার অর্থনীতির গুণকীর্তনে নেমে গেল। সংবাদপত্রের পাতায় পাতায়, টেলিভিশনের চ্যানেলে চ্যানেলে রাতারাতি আবির্ভূত হলেন এমন অজস্র বিশেষজ্ঞ, যাঁদের কাজই হয়ে দাঁড়াল দু-(;বলা বাজার অর্থনীতির তথা কাঠামোগত সংস্কারের পক্ষে ঢাক পেটানো। এমনকি একথাও লিখতে দেখা গেল ভবিষ্যতে যে সরকারই দিল্লিতে ক্ষমতায় আসুন না কেন মনমোহন সিং যাতে বরাবরের জন্য অর্থমন্ত্রী থাকতে তার ব্যবস্থা করা উচিৎ। এই সময়ে আমাদের ঘরের কাছে আনন্দবাজর পত্রিকার মালিক কাম সম্পাদক অভীক সরকার মহোদয় তাঁর পত্রিকার ৭৫তম বার্ষিকী অনুষ্ঠানে সদর্পে ঘোষণা করলেন 'আমরা পুঁজিবাদের পক্ষে—আমাদের রাজনৈতিক দর্শন হল আমেরিকায় নব্য রক্ষণশীল দর্শন।' এহেন মন্তব্যে অবাক হওয়ার কিছু নেই!

আজ সংবাদপত্র তথা গণমাধ্যমে এক অভ্যন্তরীণ সেন্সরশিপ ব্যবস্থা চালু হয়েছে যে কোন পাঠক বা দর্শকের সাদা চোখে ধরা পড়বে না। বড় বড় বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রধান লক্ষ্যই হল ধনী ও নব্যধনীদের কাছে তাদের পণ্যকে পৌঁছানো। কারণ তারাই পণ্যকে কিনতে সক্ষম। সুতরাং সংবাদপত্র এবং সামগ্রিকভাবে গণমাধ্যমের উপর ক্রমশ চাপ বাড়ছে তাকে ধনী, নব্যধনী এবং পণ্য কিনতে সক্ষম এমন ক্রেতাদের কাছে জনপ্রিয় করে তোলা। তাইতো খবরের কাগজের পাতা জুড়ে নাইট ক্লাবে হুল্লোড়ের খবর, দামি রেস্টুরেন্টে রান্নার রেসিপি এবং মরিসাস কিম্বা আল্পস পর্বতে বেড়িয়ে আসার পরামর্শ। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা, যন্ত্রণার কথা সংবাদমাধ্যমে, গণমাধ্যমে ক্রমশই আড়ালে চলে যাচ্ছে। তার কারণ আমি আপনি আগে ছিলাম reader এখন হয়ে গেছি consumer। অর্থাৎ পাঠক কিম্বা দর্শক থেকে এখন হয়ে গেছি ক্রেতা।

চারবছর আগে হিন্দুস্থান টাইমস এবং টাইমস অফ ইন্ডিয়ার মধ্যে একটা বিতর্ক হয়েছিল। বিতর্কের বিষয় ছিল সংবাদের মোড়কে বিজ্ঞাপন ছাপানো উচিৎ কিনা। ইদানীং এই প্রবণতা ভালোরকম শুরু হয়েছে। সেদিন হিন্দুস্থান টাইমস পত্রিকায় সাংবাদিক ভীর সাংভি এই প্রবণতার বিরুদ্ধে জোরালো ভাষায় কলাম লিখেছিলেন। অথচ আজ নীরা রাডিয়ার সঙ্গে গোপন কথপোকথনের টেপ প্রকাশিত হওয়ায় দেখা যাচ্ছে স্বয়ং ভীর সাংভি ব্যবসায়িক স্বার্থে নিজের লেখাকে ঢেলে সাজিয়েছেন। 'পেইড নিউজ' নিয়ে হইচই শুরু হয়েছে। অর্থাৎ পয়সা খেয়ে খবর লেখার প্রবণতা যে মারাত্মক আকার নিয়েছে, তা যে শুধু দু'একজন সাংবাদিক করছেন এমন নয়, আস্ত প্রতিষ্ঠান বিকিয়ে যাচ্ছে একথা ভারতের প্রেস কাউন্সিলও স্বীকার করেছে। টেলিভিশন চ্যানেলগুলিতে প্রায়শই বহু সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা নিয়ে আলোচনা শোনা যায়। আসলে এই আলোচনা তারা দর্শকদের উপর চাপিয়ে দিতে বাধ্য—কারণ তারাই হল মিডিয়া পার্টনার। সিনেমার গল্পে ব্র্যান্ড নাম চালিয়ে দেবার প্রবণতা চলছে। ঋতুপর্ণ ঘোষের ছবিতে তা প্রায়শই দেখা যায়। আমেরিকায় খোদ স্টিফেন স্পিলবার্গ ছবি তৈরি করছেন অজস্র ব্র্যান্ড নামকে ব্যবহার করে।

এক্ষেত্রে উপায় কী? অর্থাৎ সাধারণ মানুষের স্বার্থ, তাদের ভালো-মন্দের প্রশ্নকে সামনে আনতে বিকল্প কোনও গণমাধ্যম ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব? কাজটা খুব কঠিন, কিন্তু শুরু হয়েছে, দুনিয়া জুড়েই শুরু হয়েছে। বিষয়টি পৃথক আলোচনার দাবি রাখে। □

শোক সংবাদ

রুমা গুহঠাকুরতা

৩ জুন সোমবার সকাল ৬টা নাগাদ ৩৮ বালিগঞ্জ প্লেসে নিজ বাসভবনে ঘুমের মধ্যে প্রয়াত হন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, ধ্রুপদী ঘরানার বিশিষ্ট গায়িকা, অসামান্য অভিনেত্রী রুমা গুহঠাকুরতা। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। বার্ধক্যজনিত কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়। জন্ম ১৯৩৪ সালে কলকাতায়। বাবা সত্যেন ঘোষ ও মা সতী ঘোষ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মানুষ ছিলেন। ১৯৫২ সালে কিশোর কুমারের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৫৮ সালে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। অমিত কুমার তাদের প্রথম সন্তান। ১৯৫৮ সালে তিনি ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার প্রতিষ্ঠা করেন। তার অভিনিত বিখ্যাত ছবিগুলি হল জোয়ার-ভাঁটা (১৯৪৪), গঙ্গা, অভিযান (১৯৬২), আরোগ্য নিকেতন (১৯৬৯), দাদার কীর্তি (১৯৮০) গণশত্রু (১৯৮৯) হুইল চেয়ার (১৯৯৪)।

দেবব্রত বিশ্বাসের ছাত্রী রুমা গুহঠাকুরতা সুগায়িকাও ছিলেন। কণ্ঠ দিয়েছেন অমৃত কুম্ভের সন্ধানে, বাঘিনী, পলাতক প্রভৃতি ছবিতে।

সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, তরুণ মজুমদার, রাজেন তরফদার প্রভৃতি বিখ্যাত পরিচালকদের ছবিতে অভিনয় করেছেন।

'বিস্তীর্ণ দুপারে', 'ওঠো গো ভারত লক্ষ্মী', 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে', 'হেঁই সামালো ধান হো, কাস্তেটা দাও সানহো জান কবুল আর মান কবুল। আর দেব না আর দেব না রক্তে বোনা ধান মোদের প্রাণ হো' এই সব গণসংগীত সংগ্রামী মানুষের মনে আর সংগ্রামে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। □

সুব্রত মজুমদার

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার সমিতির অন্যতম নেতৃত্ব কমরেড সুব্রত মজুমদার মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে মুকুন্দপুরের একটি হাসপাতালে ২৭ মে সন্ধ্যা ৭-৪৫ মি-এ প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি মৃত্যুকালে রেখে গেছেন তাঁর স্ত্রী, কন্যা, জামাতা ও একমাত্র দৌহিত্রকে।

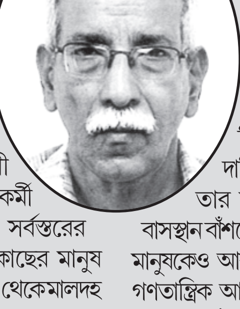

কর্মরত অবস্থায় কমরেড মজুমদার রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ভুক্ত অন্যতম কর্মচারী সংগঠন কৃষি কারিগরী কর্মী সংস্থার নেতৃত্ব হিসাবে সর্বস্তরের কর্মচারীদের অত্যন্ত কাছের মানুষ ছিলেন। কর্মজীবনের শুরু থেকে মালদহ জেলায় ও পরবর্তীকালে কলকাতায় নেতৃত্বের পদে আসীন ছিলেন।

অবসর গ্রহণের পর থেকে তিনি পেনশনার সমিতির কাজে যুক্ত হন। দীর্ঘপ্রায় ১২ বছর তিনি অনলসভাবে সমিতির কাজকর্ম পরিচালনা করেছেন। সারা রাজ্যের পেনশনার, ফ্যামিলি পেনশনারদের সমস্যা সমাধানে ও তাদের স্বাস্থ্য চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে সর্বসময় তৎপর থেকেছেন। রাজ্যের সর্বস্তরের কর্মী নেতৃত্বের তিনি কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। সমিতির দপ্তর সম্পাদক ও সহ সম্পাদকসহ বিভিন্ন পদে তিনি আসীন ছিলেন। ২৫ মে সকালে রোগাক্রান্ত হওযার আগে পর্যন্ত তিনি সমিতির দপ্তরে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার সুমধুর ব্যবহার তাঁর বাসস্থান বাঁশদ্রোনী এলাকার সাধারণ মানুষকেও আকৃষ্ট করতো। এলাকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্বের সাথেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠেছিল। তাঁর মরদেহ চিকিৎসা বিজ্ঞানে সাহায্যের প্রয়োজনে এনআরএস হাসপাতালে প্রদান করা হয়। □

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
48th Year, 1st Issue, April-May 2019

Regd. No. : 18484/71
Price : Two Rupees

এপ্রিল-মে মাসজুড়ে

বহুমাত্রিক আন্দোলনে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

এপ্রিল ও মে মাস ছিল লোকসভা নির্বাচনের মাস। নির্বাচনী কাজে শুরুর প্রস্তুতি পর্ব থেকে একেবারে গণনা পর্যন্ত গোটা প্রক্রিয়াটার সাথে ওতপ্রোতোভাবে যুক্ত ছিলেন রাজ্য সরকারী কর্মচারী বন্ধুরা। স্বভাবতই তাঁদের নিরাপত্তা, নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব প্রতিপালনের উপযুক্ত পরিকাঠামো এবং সর্বোপরি পোস্টাল ব্যালট বা ই ডি সি-র মাধ্যমে ভোট দানের অধিকারের বিষয়ে সংগঠন সদা সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল। যখনই কোনো সমস্যা হয়েছে অথবা প্রচলিত নিয়ম থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি তৎপরতার সাথে নির্বাচন কমিশনের কাছে পত্র লিখে এ বিষয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু শুধুমাত্র এর মধ্যে সংগঠনের কাজ সীমাবদ্ধ থাকেনি। গত ৭ মে সারা রাজ্যজুড়ে, বিভিন্ন জেলার সদরে এবং কলকাতায় বিক্ষোভ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বিক্ষোভ সভা থেকে নির্বাচনী কাজে যুক্ত কর্মচারীদের নিরাপত্তার দাবিটি জোরালোভাবে উত্থাপন করা হয়। রাজ্য সরকারী কর্মচারীসহ রাজ্য কোষাগার থেকে বেতন পান এমন সমস্ত অংশের কর্মচারী ও শিক্ষকদের মহার্ঘভাতা ও বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করার দাবিতে, সংগঠনের লাগাতার উদ্যোগ জারি রয়েছে। গত ১৮ এপ্রিল এই দুই দাবিকে সামনে রেখে সারা রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ সভা হয়। ২৬ মে ছিল বেতন কমিশনের সুপারিশ সরকারের কাছে জমা দেওয়ার শেষ দিন। অথচ ২৭ মে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে সরকারের পক্ষ থেকে বেতন কমিশনের মেয়াদ পুনরায় ৭ মাসের জন্য বৃদ্ধি করা হয়। এই কর্মচারী স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গত ২৮ মে সারা রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও এই সময়কালে প্রতিপালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস, মে দিবস এবং জেলায় জেলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে আলোচনা সভা ও কর্মী সভা। এমনই কিছু কর্মসূচীর ছবি নিচে দেওয়া হল।

নির্বাচন কমিশনারের সাথে সাক্ষাৎ

রাজ্য নির্বাচন কমিশন দপ্তরে বিজয় শংকর সিংহ ও বিশ্বজিৎ গুপ্তচৌধুরী

গত ১৭ মে ২০১৯ বেলা ৩ টায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিগণ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ইতিপূর্বে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে গত ১৫/৩/২০১৯, ১/৪/২০১৯ এবং ১৩/৫/২০১৯ তারিখে নির্বাচনী কর্মীদের নিরাপত্তা এবং পোস্টাল ব্যালট, ই ডি সি'র মাধ্যমে ভোটদান সুনিশ্চিত করার আবেদন জানানো হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও, ছয় পর্যায়ে বিশেষ করে শেষ পর্যায়ে (১২/৫/২০১৯) নির্বাচনে এ বিষয়ে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করা যায়। হাওড়া এবং হুগলী জেলায় বেশ কিছু ভোট কর্মী তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হন। এমনকি, শেষ পর্যায়ে আগামী ১৯/৫/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে কলকাতাসহ উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ভাল সংখ্যক ভোট কর্মীরা যথা সময়ে আবেদন করা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত পোস্টাল ব্যালট ও ইডিসি সার্টিফিকেট হাতে না পাওয়ায় তাদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হচ্ছে।

ভোট কর্মীদের ভোটাধিকার সুনিশ্চিত করার দাবি নিয়ে অতিরিক্ত নির্বাচনী আধিকারীকের সাথে আলোচনা করে তাঁর দ্রুত হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়। অতিরিক্ত নির্বাচনী আধিকারিক অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েই বক্তব্যগুলি শোনেন এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। পোস্টাল ব্যালট এ্যাটেস্টেশন বিষয়ে আলোচনায় তিনি জানান যে গেজেটেড অফিসার মাত্রই তিনি পোস্টাল ব্যালট এ্যাটেস্টেশনের অধিকারী। এ ক্ষেত্রের কোন ধরনের সংশয় যাতে না থাকে সে বিষয়ে অবহিত করেন এবং ভোট কর্মীদের ভোট দানের অধিকার সুনিশ্চিত করার আশ্বাস দেন।

কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদলে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ, যুগ্ম-সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, সহ-সম্পাদক মানস দাস। □

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে সংগঠনের পত্র

মাননীয় তারিখ ঃ ১৪.০৫.২০১৯

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক
পশ্চিমবঙ্গ

বিষয় ঃ নির্বাচনী কাজে নিযুক্ত কর্মীদের ভোটদানের গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিতকরণ

মহাশয়,

আপনার স্মরণে আছে সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন-২০১৯ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে পরিচালনা সহ ভোটকর্মীদের গণতান্ত্রিক অধিকার পোস্টাল ব্যালট বা ইডিসি তে ভোট দানের প্রক্রিয়া সুনিশ্চিত করতে গত ১ এপ্রিল, ২০১৯ সাক্ষাৎকার চেয়ে একটি পত্র দিয়েছি।

এই সময়ে সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল জেলা ও কলকাতার নির্বাচন কর্মী হিসেবে নিযুক্ত কর্মচারী ও শিক্ষক মহাশয়গণ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্থাৎ ভোট দানে অংশগ্রহণ করতে না পারায় ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। পোস্টাল ব্যালট বা ইডিসি প্রক্রিয়ার জন্য যথাসময়ে প্রয়োজনীয় পত্র (ফরম ১২/১২এ) জমা দিলেও ভোট দানে অংশগ্রহণ করার জন্য পোস্টাল ব্যালট বা ইডিসি-র কোন চিঠি বা পত্র সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা হাতে পাননি।

এই পরিস্থিতিতে সমগ্র বিষয়ের উপর আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এছাড়া রাজ্যের ভোটকর্মী হিসাবে যুক্ত কর্মচারী ও শিক্ষক মহাশয়দের দেশের নাগরিক হিসাবে গণতান্ত্রিক অধিকার ভোটাধিকার প্রয়োগ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

ইতি
ভবদীয়
বিজয় শংকর সিংহ
(বিজয় শংকর সিংহ)
সাধারণ সম্পাদক

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।